লাশকাটা টেবিল

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

কিছু কথা

এই পৃথিবীর প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য আছে। শুধু মানুষ তা ব্যক্ত করতে পারে, জড় বা মূক যারা তাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না বলেই কত অসংখ্য কাহিনী, কত অভাব, কত অভিযোগ, কত সুখের কথা অ-বলাই থেকে যাচ্ছে।

আমি যেমন জানি, আপনিও ঠিক তাই জানেন, কোন লাশকাটা টেবিলের পক্ষে ধারাবাহিক ভাবে কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার বক্তব্য হল, এই অসম্ভব যদি কোনক্রমে সম্ভব হয় তাহলে কি আমরা বিচিত্র সমস্ত কাহিনী শুনতে পাব না? চিন্তা করে দেখুন, একটি জনবহুল শহরের মর্গে প্রতিদিন কত মৃতদেহ আসছে। তাদের শোয়ানো হচ্ছে লাশকাটা টেবিলের উপর। এই সমস্ত দেহ শল্যবিদরা কেটেকুটে মৃত্যু কোন পথ বেয়ে এসেছে তা নির্ধারিত করছেন। বলা বাহুল্য মৃত্যুগুলি সবই অপ্রাকৃতিক। অর্থাৎ কেউ খুন হয়েছে অর্থের জন্য, কেউ ঈর্ষার শিকার, কেউ প্রেমের বলি, কেউ বিশেষ কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কারুর জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়েছে, দৈবাৎ দুর্ঘটনায় কারুর দেহ পিষ্ট হয়েছে, আবার কেউ মানসিক বিকারে অতিষ্ট হয়ে নিজেকে হত করেছে নিজের অস্ত্র দিয়ে, মৃত্যুগুলি আগুনে, ছোরার ডগায়, দড়িতে—যে ভাবেই আসুক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু একটি নেপথ্য-কাহিনী আছে। ওই সমস্ত কাহিনীর অধিকাংশই আমাদের অজানা থেকে যায়। এই পৃথিবীতে অহরহই কত অভাবনীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আমরা বিস্ময় বোধ করি। তেমনি ধরুন একটি লাশকাটা টেবিল যদি হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ করে, কত অজানা কাহিনীই তো আমরা জানতে পারব।

এই আখ্যায়িকায় একটি লাশকাটা টেবিল তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে। ব্যাভিচার, দুর্নীতি ও প্রতিহিংসার ইতিহাস বর্ণনা করার ফাঁকে ফাঁকে সে বলেছে—এই সমস্ত শুনে যদি আমরা সামলাবার সুযোগ পাই, যদি আমরা নিজেদের বুঝে-সুঝে চালিত করি—আমরা আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন আনতে পারব কিনা তা পরের কথা। এখন তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে গেলে তো আর কোন ক্ষতি নেই। জানি না পাঠক-পাঠিকারা আমার এই মনোভাবের সঙ্গে একমত হবেন কিনা। তবু লাশকাটা টেবিলের অভিজ্ঞতার কথা আমি তাঁদের সামনে সসঙ্কোচে তুলে ধরছি।

আমি লাশকাটা টেবিল।

এক এক সময় মনে হয় নিজের মনের কথা উজাড় করে কাউকে বলি। ভব্য বেশ আর সভ্যতায় মোড়া মানুষের মনের মধ্যে যে ক্লেদাক্ত রূপ আছে, তার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করি। আজ সেই ধরনের দুর্নিবার ইচ্ছায় আমায় পেয়ে বসেছে। আমি বলব —বলবই। তোমরা অবাক হয়ে শোন আমার অভিজ্ঞতার কথা। আমি জানি, আমার কাহিনী শোনার পরও, সমাজে যে চূড়ান্ত দুর্নীতি চলেছে তার প্রতিকার তোমরা করতে পারবে না। তবু শুনে রাখ।

আরম্ভ করি তাহলে -

১৯৪২ সাল। সমস্ত পৃথিবীতে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা। ইউরোপ আর আফ্রিকাতে চলেছে রক্তের হোলি খেলা। জাপান বিরাট এশিয়া খণ্ডকে ক্রমেই মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলছে। ভারত পরাধীন দেশ। তার পক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল প্রবল। কিন্তু এই বিরাট দেশকে জড়িয়ে পড়তে হল যুদ্ধের সঙ্গে। জাপানের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের উপর না পড়লে কি হত বলা যায় না। মনে হয় না ইংরেজরা তাদের গোল্ডমাইন ভারতকে যুদ্ধের আওতায় টেনে আনত !

যাই হোক, ভারত কিভাবে দ্বিতীয় মহাসমরে জড়িয়ে পড়ল সে প্রশ্ন এখানে বড় নয়। যুদ্ধের ফলাফল ও সমরনীতির সম্বন্ধে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে আমার আখ্যায়িকার সঙ্গে মহাসমরের সম্পর্ক আছে—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

সেদিন বুধবার।

দুপুর বেলা।

ডোমেরা ধরাধরি করে একটি মৃতদেহ আমার উপর এনে রাখল।

নারী দেহ।

মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল চারদিক। মেয়েটির টয়লেট-চর্চিত শরীর থেকেই গন্ধ আসছে। আমি পুলকিত হলাম। বহুদিন পরে অভিজাত ঘরের একটি মেয়ে এসেছে আমার বুকের উপর। দেখলাম তাকে খুঁটিয়ে।

টকটকে রং। দীঘল নাসা। তুলি দিয়ে টানা ভ্রূ। ছন্দময় চোখদুটি। এক কথায় অপূর্ব সুন্দরী সে। ঘাড়ের একটু নিচে গভীর ক্ষত। চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। হয়তো পনের ষোল ঘণ্টা আগে।

কে তাকে খুন করেছে কে জানে !

কেন যে এই সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের মানুষ খুন করে আমার মাথায় ঢোকে না। আমি হলে এদের সহস্র অপরাধকে ক্ষমা করতাম। এদের রূপের নেশায় তন্ময় হয়ে থাকতাম। আদরে-সোহাগে ভরিয়ে তুলতাম। সম্ভব হলে এদের অস্থি-মজ্জাকে মিলিয়ে ফেলতাম নিজের শরীরের সঙ্গে।

মেয়েটিকে টেবিলের উপর রাখার পরই লাশকাটা ঘরে ব্যস্ততার ঝড় উঠল। প্রবীণ অভিজ্ঞ সার্জেনরা এলেন। এঁদের সকলকেই আমি চিনি। বেশ কিছুদিন থেকে দেখতে দেখতে তাঁদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আমার হয়েছে। ওঁরা এসে দাঁড়ালেন আমার দুপাশে।

জন কয়েক ছাত্রও সঙ্গে রয়েছে।

লাশকাটা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যই তাদের এখানে আসতে হয়। ডোমেরা মেয়েটিকে উলঙ্গ করে দিল। ফুলের মত নরম দেহটি এখন কঠিন আকার নিয়ে নগ্ন অবস্থায় পড়ে রইল আমার উপর। সাধারণতঃ সার্জেনদের নির্দেশে ডোমেরাই কাটাকাটির কাজ সারে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ধর নিজেই প্রস্তুত হলেন।

স্পিরিট দিয়ে মৃতদেহ পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছিল। ডাঃ ধর করাত ও অন্যান্য সার্জিক্যাল অস্ত্রের সাহায্যে ফালা ফালা করে কাটলেন তরুণীর দেহ। পাকস্থলী গভীরভাবে পরীক্ষা করবার পর ডাঃ ধর তাকালেন সহযোগীদের দিকে। তারপর সরে গেলেন আমার কাছ থেকে।

হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে বললেন, স্পাইনাল কর্ডের উপর যে গভীর ক্ষত রয়েছে মৃত্যু তাতে হয়নি।

তাঁর সিদ্ধান্তকে সকলে সমর্থন করলেন।

তিনি আবার বললেন, পাকস্থলীর মধ্যে যে ভেষজ নির্যাস পাওয়া গেছে মৃত্যুর কারণ হল ওই। বুঝে ওঠা কষ্টকর, হত্যাকারী দুই পন্থা অবলম্বন করেছিল কেন।

কয়েকদিন পরে সংবাদ পেলাম মেয়েটির হত্যাকারী ধরা পড়েছে।

এবং নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করেছে পুলিশের কাছে।

ডাক্তারদের আলাপ-আলোচনার দরুন আমিও পুরো ঘটনাটা জেনে ফেললাম। মেয়েটির নাম, জোহরা। হিমালয়ের সৌন্দর্যপূর্ণ উপত্যকা গাড়োয়াল—জোহরা ছিল সেখানকার অধিবাসিনী। নাম তার মুসলমানী ধরনের হলেও জাতে সে ছিল হিন্দু।

অবশ্য জোহরা নামটি তার মাতৃপিতৃদত্ত নয়।

অমৃতসরের বিলাসী তরুণরা এই নামকরণ করেছিল তার। কিন্তু সে

অনেক পরের কথা। আগে প্রথমকার ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলে রাখা প্রয়োজন। বিত্তশালী না হলেও, মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে এরকম পরিবারে জোহরার জন্ম হয়েছিল। যৌথ পরিবার। দু'বেলা পাত পড়তো পঞ্চাশ-বাহান্ন জনের।

রামবল্লভ সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন।

একটিমাত্র মেয়ে জোহরাকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। দিনভোর তিনি পরিশ্রম করতেন ক্ষেত-খামারে। বিকেলে বাড়ি ফিরে সময় কাটত মেয়েকে নিয়ে। জোহরার তখন কতই বা বয়স -চার উতরে পাঁচে পা দিয়েছে।

স্ত্রী কৌশল্যা অনুযোগ করে বলত, আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথা আর খেয়ো না।

রামবল্লভ হাসতেন। বলতেন, আমার আর্থিক অবস্থা যদি আরো ভাল হত তাহলে দেখতে আদর দেওয়া কাকে বলে।

—আর দেখে দরকার নেই। যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না যে, বড় হবার পর এই আব্দারে মেয়েকে গ্রামের কোন ছেলে বিয়ে করবেন।

—গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিলে তো? আমার মেয়ের বিয়ে হবে শহরের বড় ঘরে।

কিন্তু রামবল্লভের সে আশা পূর্ণ হয়নি, জোহরার যখন আট বছর বয়স তখন কয়েক দিন জ্বরে ভুগে মারা গেলেন তিনি। কৌশল্যার জীবনে নেমে এল অজস্র অন্ধকার। তবু সে নিজেকে অল্পদিনেই সামলে নিল। রামবল্লভের আদরের মেয়েকে মানুষ করে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে শোকের মধ্যে ডুবে থাকা চলে না। মেয়ের মধ্যে দিয়েই এখন ওকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু রামবল্লভের মৃত্যুতে কৌশল্যার জীবনে যে দুর্যোগের সূচনা হয়েছিল ক্রমেই তা ঘনঘোর হয়ে উঠতে লাগল। সংসারে যা অশান্তি। জা, ভাসুর-দেওরের উঠতে-বসতে গালাগালি তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। ম্রিয়মাণ কৌশল্যা এক এক সময় ভেবেছে ঝাঁপিয়ে পড়বে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে। কিন্তু পারেনি, জোহরার জন্যেই পারেনি।

এই রকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বছরখানেক কেটে গেল।

বাপের বাড়িতে যদি কেউ থাকত তবে কৌশল্যা কবে চলে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাও নেই। যাই হোক, এই সময় পাঠানকোট থেকে কৌশল্যার মামাত দেওর কিষনলাল এল বিপদে পড়ে। তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। ছেলেমেয়েদের সামলান এবং সংসার চালান তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে—বিশেষ বাড়িতে আর কোন মহিলা নেই। তাই প্রতিবেশী একটি পরিবারকে স্ত্রীর সাহায্যার্থে রেখে এখানে ছুটে এসেছে একজন কাউকে নিয়ে যেতে।

এখানে প্রচুর সমবেদনা লাভ করল কিষনলাল।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, এই বিপদের দিনে সহযোগিতা করতে হবে বৈকি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে যাবে? সকলেরই সংসার আছে, দায়-দায়িত্ব আছে। অগত্যা ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো কৌশল্যাকে পাঠানকোট পাঠানই স্থির হল। এই পরিবেশ থেকে কিছুদিনের জন্যে পরিত্রাণ পেয়ে কৌশল্যাও খুশি হল।

কিষণলাল কৌশল্যাকে পাঠানকোটে নিয়ে গেল।

সচ্ছল পারিবারিক অবস্থা তার, কিন্তু সংসারে সুখ নেই। কঠিন রক্ত-শূন্যতায় ভুগছে ভেদবতী -কিষনলালের স্ত্রী। ডাক্তার বলছে এই রোগকে পার্নিসাস অ্যানিমিয়া বলে। বিছানা থেকে প্রায় উঠতে পারে না ভেদবতী। ভীষণ খিটখিটে হয়ে উঠছে। স্বামীর সঙ্গে মতান্তর লেগেই আছে।

ভেদবতীর সেবায় মন দিল কৌশল্যা। তার ছেলেমেয়েদের আদর-যত্নে ভরিয়ে তুলল। এইভাবেই দিন কেটে গেলে ভাল ছিল। কিন্তু কাটল না। দুর্যোগ আরো ঘন হয়ে এল কৌশল্যার ভাগ্যাকাশে। একদিন গভীর রাত্রে ঘুমহীন চোখে সে যখন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে তখন হঠাৎ লক্ষ্য করল, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ভেজানো দরজা। পাল্লা সম্পূর্ণ খুলে যাবার পর ঘরে প্রবেশ করল অতি সন্তর্পণে কিষনলাল।

ত্রাস্ত কৌশল্যা বিছানায় উঠে বসল।

দ্রুত গলায় বলল, একি আপনি—? ভেদবতী কি বেশি শরীর খারাপ বোধ করছে।

বিছানার অনেক কাছে এগিয়ে এল কিষনলাল। ধরা গলায় বলল, না। সে ঘুমাচ্ছে। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

কৌশল্যা কেমন ভয় পেয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, আমায়! এখন?

—হ্যাঁ। এখন।

নিজের অতৃপ্ত মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিষনলাল কিন্তু পারেনি। কৌশল্যার আগুনের মত রূপ তাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছে। ভেদবতী যদি সুস্থ সবল থাকত, তাহলে হয়তো এই বিকার তার মনে বাসা বাঁধত না। দীর্ঘদিন অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে মনের বা দেহের কোন সম্পর্ক নেই, কিষনলাল তাই বুভুক্ষু হয়ে উঠেছে।

একটু ইতস্তত করল কিষনলাল তারপর আবার বলল—নিজের মনের তীব্র বাসনাকে আকুলকণ্ঠে প্রকাশ করল। শিউরে উঠল কৌশল্যা। এ সমস্ত কি শুনছে ও। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।

কৌশল্যা দ্রুত গলায় বলল, না—না -তা হয় না —তা হয় না—

—কেন হয় না? নিশ্চয় হয়। তুমি হেলায় কেন নিজের যৌবনকে নষ্ট করবে?

কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধের পরও কৌশল্যাকে রাজী করান গেল না যখন তখন অনুরোধের পথ পরিহার করে বলপ্রয়োগ করল কিষনলাল। তার বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে অসহায় কৌশল্যা ছটফটিয়ে উঠল। তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কৌশল্যার নিস্তেজ দেহটিকে নিজের খেয়াল-খুশি মত ব্যবহার করতে কোনই অসুবিধা হল না কিষনলালের।

কয়েকদিন কেটে গেছে আরো।

কৌশল্যা আর বাধা দেয়নি। ও জানে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এই আশ্রয় থেকে চ্যুত হবে। মেয়ের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করে তোলা যাবে না কখনই। কিষণলাল নিয়মিত রাত্রে এসেছে ওর কাছে—বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু এইভাবেও দিন কাটল না।

একদিন ওরা ধরা পড়ে গেল ভেদবতীর হাতে। অকথ্য গালাগালিতে জর্জরিত করল ভেদবতী কৌশল্যাকে। চাকরের সাহায্যে বাড়ি থেকে বার করে দিল। গভীর রাত্রে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল কৌশল্যা। এখন কোথায় যাবে ও? কে ওকে আশ্রয় দেবে?

খুব বেশিক্ষণ চিন্তা করতে হল না। কিষনলাল এসে উপস্থিত হল।

বলল, ভালই হল। ভেদবতীর চোখের আড়ালে যাবার সুযোগ পেলাম আমরা।

কৌশল্যা কোন রকমে বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কিষনলাল বলল, এই ঘটনার পর তোমার শ্বশুরবাড়িতেও তোমার জায়গা হবে না। কোথায় যাবে তুমি? তোমাকে তো ভেসে যেতে দিতে পারি না। আমার বন্ধু দুবের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এখন তুলব। সেখানে কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। সে অবিবাহিত।

সেই রাত্রেই কিষনলাল দুবের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল কৌশল্যাকে।

দিন কেটে যেতে লাগল।

অবশ্য কিষনলালের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে দুবের কাছে চলে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না কৌশল্যার। এবং এক বছরের মধ্যেই দুবের কাছ থেকে আনন্দের কাছে—আনন্দের কাছ থেকে রামসেবকের কাছে···এইভাবে সমাজের ক্লেদাক্ত মানুষগুলি ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলল। হস্তান্তরিত হতে হতে কৌশল্যা পাঠানকোট থেকে ছিটকে অমৃতসরে এসে পড়েছিল। এবং সব শেষে কারুর ক্রীড়নক হয়ে থাকার পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করে কোঠায় গিয়ে বসল। বলা বাহুল্য অল্প দিনের মধ্যে অমৃতসরের বারবধূ সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে নিল।

কত বছর কেটে গেছে তারপর।

কৌশল্যা আর নেই। ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এক রহিসের সঙ্গে যাচ্ছিল হোসিয়ারপুর। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ওর স্থান পূর্ণ করেছে ওর মেয়ে। পিতৃদত্ত নামে তাকে কেউ চেনে না। সকলে তাকে জোহরা বলে ডাকে।

জোহরা তার সমাজের প্রতিটি মেয়ের ঈর্ষার পাত্রী। তার মিষ্টি গলা, তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, তার পুরন্ত দেহ—মানুষকে পাগল করে রেখেছে। জোহরা নিজের মূল্য বোঝে তাই নিংড়ে টাকা আদায় করতে কসুর করে না। দু'হাত দিয়ে অপর্যাপ্ত টাকা রোজগার করেও কিন্তু এ জীবনে সে খুশি নয়। তার ইচ্ছে আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করবার পর, একদিন অমৃতসরের এই পঙ্কিল পরিবেশ থেকে সে বিদায় নেবে। বিদায় নেবে সকলের অলক্ষ্যে।

চলে যাবে অনেক দূরে। বিহার কি বাংলার কোন শহরে গিয়ে বাসা বাঁধবে। আর দশটা মেয়ের মত বিয়ে করে, স্বামী ও সন্তান নিয়ে ঘর করবে। বাকী জীবনটা কাটাবে সুখে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা হয় না। বিপদের কালো মেঘ হঠাৎ দেখা দিয়ে সমস্ত কিছুকে ছত্রখান করে দেয়।

জোহরার জীবনেও তাই ঘটল।

সেদিন ১৩ই নভেম্বর।

কনকনে হাওয়া দেওয়ায় শীত বেড়ে গেল চতুর্গুণ।

জোহরার সুসজ্জিত কক্ষে আলো ঝলমল করছে। দামী গালিচার উপর বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিতা হয়ে ও বসেছে। ওর একপাশে তবলচি ও সারাঙ্গী-বাদক। অন্য পাশে একটি বয়স্কা মেয়ে। তার হাতের কাছে পান সাজবার সরঞ্জাম। সে অনবরত পান সেজে চলেছে। সামনে নানা পোশাকে সজ্জিত আট দশ জন লোক বসে।

জোহরা দীর্ঘ লয়ের একটা গান ধরেছে। মিষ্টি গলায় গেয়ে চলেছে তন্ময় হয়ে। মেহেদি ছোপান নূর দাড়ি নেড়ে সারাঙ্গীবাদক ছড় টেনে চলেছে। তবলচির তো কথাই নেই। তার হাত দিয়ে ঝড় বইছে।

গান এক সময় শেষ হল। শ্রোতারা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল—'কেয়াখুব কেয়াখুব' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল। নোটের বৃষ্টি হতে লাগল। কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল, জানেমান আরেকটা হোক। আড়মোড়া ভেঙে সবিনয়ে জোহরা বলল, আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারছি না, ক্ষমা করবেন। আজ শরীর তেমন ভাল নেই।

শ্রোতারা বিদায় নেবার পর জোহরা নোটগুলি কুড়িয়ে একত্রিত করল। তবলচি ও সারাঙ্গীবাদককে তাদের হিসেব বুঝিয়ে দিল। দশটাকার নোট বয়স্কা মহিলাটির হাতে গুঁজে দেবার পর তারা নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

জোহরা উঠে দাঁড়িয়ে বড় আলো নিভিয়ে দিল। স্তিমিত আলোয় ঘরখানাকে মায়াময় মনে হতে লাগল।

ও গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে।

রাত হয়েছে। শান্ত হয়েছে বারবধূ পল্লী। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়েছে নিজের নিজের মানুষকে নিয়ে। জোহরা লক্ষ্য করল রাস্তা দিয়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাতে ছোটাতে একদল মাতাল যাচ্ছে। এরা শুধু হৈ-হল্লা করতেই ভালবাসে।

ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

—জোহরা বাঈ—

চমকে মুখ ফেরাল জোহরা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুবারক। দীর্ঘ দেহী সুদর্শন মুবারক ওর দিকে এগিয়ে এল।

বলল, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিলে মেরিজান ?

—কিছু না। এমনি দাঁড়িয়েছিলাম।

মুবারক এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আমি ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখন একলা পাব।

—একি ! আবার মদ খেয়েছ ! নাকের ওপর ওড়না চেপে সরে এল কয়েক পা জোহরা।

—খেয়েছি।

—কেন যে খাও বুঝি না ! তোমাকে কতবার বলেছি না, মদ খাবার পর আমার কাছে আসবে না।

মুবারক কোমরে হাত দিয়ে গলা ফাটিয়ে হাসল।

বলল, তোমার কথা শুনলে সত্যি হাসি পায় জোহরা বাঈ। কোঠায় থেকে মদকে অপছন্দ করবে তাও কি হয় ! ও কথা এখন থাক। এবার তোমাকে কিছু লাভের কথা বলি।

জোহরা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, লাভের কথা--

—করনচন্দ এসেছে। নিচে গাড়িতে বসে আছে সে।

কিন্তু…

জোহরাকে কথা শেষ করতে দিল না মুবারক।

—কোন কিন্তু নয়। অনেক দিন পরে করনচন্দ এসেছে। তার মত শেঠকে বিমুখ করা ঠিক হবে না। বিশেষ এক রাত্রির জন্যে হাজার দেবে।

—কিন্তু আমার শরীর আজ মোটেই ভাল নেই।

—খুব বেশিক্ষণ সময় তোমাকে দিতে হবে না। বুড়ো শেয়ালটা এমনিতেই মদের ঝোঁকে ঝুঁকছে। আরো এক আধটা বোতল খাইয়ে দিলেই সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়বে। তারপর তুমিও রাত ভোর ঘুমোও—টাকাটাও হাতে এল।

অনিচ্ছার সঙ্গে জোহরা বলল, বেশ নিয়ে এস শেঠকে।

মুবারক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল মিনিট দশেক পরে, সঙ্গে শেঠ করনচন্দ।

করনচন্দের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মেদবহুল নেয়াপাতি শবার। হাসি হাসি মুখ। দুই ভ্রুর মাঝখানে বিরাট চন্দনের ফোঁটা। কানে হীরের টপ। একমাথা তৈলাক্ত কোঁকড়া চুল।

জোহরা তসলিম করল করনচন্দকে। করনচন্দ তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসতে বসতে বলল, কেমন আছো জোহরা বাঈ?

- ভালই আছি শেঠজী।

—অনেকদিন পরে এলাম। তোমাকে তো আরো সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখছি।

জোহরা লজ্জার ভান করল।

মুবারক বলল, বোতল আনব নাকি শেঠজী?

—নিশ্চয়ই। কিছু আগে কয়েক পেগ খেয়েছি বটে কিন্তু নেশা তেমন জমেনি। ভাল মাল কিছু নিয়ে এস।

করনচন্দ পকেট থেকে টাকা বের করল।

টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল মুবারক। ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে বোতল হাতে করে। জোহরার হাতে বোতলটা দিয়ে বলল, এবার আমি যাই শেঠজী। রাত আপনার ভালই কাটবে আশা করি।

করনচন্দ হো হো করে হাসলেন।

মুবারক জোহরাকে ইশারা করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। ইশারার অর্থ হল, আমার বখরা যেন ঠিক থাকে। জোহরা দরজা বন্ধ করে শেঠের কাছে এসে বসল ঘনিষ্ঠ হয়ে। তার পরের চিত্র নাইবা আঁকা হল।

ক্রমে রাত আরো গভীর হল। বোতল শেষ হয়ে গেছে। শেঠ করনচন্দ জাজিমের উপর এলিয়ে পড়েছেন। নেশা আর ঘুম তাঁকে একই সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে। তাঁর বিরাট বুক উঠছে নামছে—ভারী নিশ্বাস পড়ছে। জোহরা দরজা খুলে বাইরে এল। ওকে একবার বাথরুমে যেতে হবে।

বারান্দার শেষপ্রান্তে বাথরুম। জোহরা বাথরুমে যাবার পর পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করল মুবারক। এতক্ষণ বোধহয় কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল। করনচন্দের দিকে তাকাল মুবারক। লোভে তার দুচোখ ঝকঝকিয়ে উঠল। একটু ইতস্তত করল। তারপর ঝুঁকে পড়ে করনচন্দের কোটের পকেট থেকে সন্তর্পণে নোটের তাড়াটা বার করে নিল। কিন্তু সকলের অগোচরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার অবকাশ পেল না সে।

দরজার গোড়ায় ততক্ষণে জোহরা এসে দাঁড়িয়েছে।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মুবারকের দিকে।

মুবারক একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণে সে ভয়কে জয় করে দৃঢ় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল কয়েক পা।

—পথ ছাড় জোহরা বাঈ।

-না। পথ আমি ছাড়ব না।

দ্রুত দরজার অর্গল তুলে দিল জোহরা।

—ছি-ছি-ছি একি করলে তুমি—

—বেশ করেছি। ওই শেঠের বাচ্চার অনেক টাকা। যা নিয়েছি তাতে ওর কিছু আসবে যাবে না।

- টাকা যেখান থেকে নিয়েছো সেখানে রেখে দাও মুবারক।

মুবারক দৃঢ় গলায় বলল, না, রেখে আমি দেব না। তুমি বোকামি করতে পার জোহরা বাঈ কিন্তু আমি বোকামিকে প্রশ্রয় দেব না। শোন দিলরুবা, অর্ধেক টাকা আমি তোমায় দিচ্ছি। এই নাও—

মুবারক নোটের তাড়া থেকে এক গোছা নোট আলাদা করে এগিয়ে ধরল। দ্রুত গলায় জোহরা বলল, না, ও টাকা আমি ছোঁব না। এতদিন দেখার পরও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না! এতে আমার ঘরের দুর্নাম হবে মুবারক। ঘুম ভাঙার পরই শেঠ বুঝতে পারবে তার পকেটে টাকা নেই তখন আমি তাকে কি জবাব দেব। তুমি টাকাটা আবার রেখে দাও। কথা দিচ্ছি, যেমন করে হোক ভুলিয়ে ভালিয়ে শেঠের কাছ থেকে আমি ওই টাকা আদায় করব।

কদর্যভাবে হাসল মুবারক।

—বেশ্যার আবার এত ন্যায়পরায়ণতা কেন? দুর্নাম! কিসের দুর্নাম! ওরকম শেঠ কত আসবে যাবে। তোমাকে টাকার অর্ধেক দিতে চাইলাম, নিলে না—ভালই। আর আমি এখানে অপেক্ষা করব না।

জোহরা দরজার কাছ থেকে সরে গেল না।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—সরে না দাঁড়ালে আমি তোমাকে জোর করে সরিয়ে দেব।

মুবারক এগিয়ে আসতেই প্রাণপণ শক্তিতে জোহরা তাকে ধাক্কা মারল। এ্যালকোহলের গুণে এবং উত্তেজনার দরুন মুবারকের অবস্থা তখন সংযত ছিল না। সে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল করনচন্দের পর্বতপ্রমাণ দেহের উপর। শেঠের মৌতাতের ঘুম ভেঙে গেল।

সে কোন রকমে উঠে বসে অসংলগ্ন গলায় বলল, আঁ—একি—এ সমস্ত কি ব্যাপার—

তার পরই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মুবারকের হাতে ধরা নোটের গোছার

উপর। সচকিত করনচন্দ নিজের পকেট হাতড়েই চেঁচিয়ে উঠল, আমার টাকা —আমার পকেট থেকে তুমি টাকা বার করে নিয়েছ মুবারক—

মুবারক উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

—চুপ। প্রাণের মায়া থাকলে চেঁচাবার চেষ্টা কর না।

—চোর —আমার টাকা নিয়ে আবার গলাবাজি করা হচ্ছে।

—চুপ করে বসে থাক, নইলে গলা টিপে শেষ করে দেব তোমাকে।

করনচন্দ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, চোর—ডাকাত —আমার সব লুটে নিলে।

একলাফে মুবারক তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। শেঠকে টেনে আনল জানালার কাছ থেকে। আরম্ভ হল দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। এক সময় করণচন্দ ছিটকে পড়ল একেবারে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার দিকে আর এগিও না মুবারক। আমি নিরস্ত্র নই। এই সমস্ত পল্লীতে আমি নিরস্ত্র আসি না। আমার পকেটে রিভলবার আছে।

ততক্ষণে হোয়াট নটের উপর থেকে ছুরিটা তুলে নিয়েছে মুবারক। ফলার দুধারে ধারসম্পন্ন ঝকঝকে মোরাদাবাদী ছুরি। এই ছুরি দিয়ে জোহরা আপেলকে টুকরো করে। ত্রাহি, ত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে শেঠ তখন পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বার করছেন।

তারপরই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল।

বিস্ফারিত চোখে জোহরা দেখল, রিভলবার বার করবার আগেই করনচন্দের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মুবারক। তার তলপেটে আমূল বসিয়ে দিল ছুরিখনা। টেনে বার করে নিল আবার। ছুরিটা টেনে বার করে নেবার পর গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল শেঠ করনচন্দ।

জাজিম লাল হয়ে উঠল। উলটে গেল রুপোর পিকদানি। পানের রস আর রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেল। বারকয়েক ছটফট করেই চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল রসিক শেঠ।

—একি করলে? জোহরা রীতিমত কাঁপছে।

রুমাল দিয়ে ছুরির মুঠোটা মুছতে মুছতে মুবারক বলল, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আমি যাব।

—যাবে! আর—অনুনয়ে ভেঙে পড়ল জোহরা, এই মৃতদেহের ব্যবস্থা না করলে আমি বিপদে পড়ব—পুলিশ আসবে—তখন—

—তোমার মড়া কান্না শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নেই। বাধা দেবার চেষ্টা কর না। মাথায় খুন চেপে রয়েছে। তোমাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না।

সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু অর্গলে হাত দেবার আগেই দ্রুত করাঘাত পড়ল দরজায়, কোলাহল শোনা গেল। শেঠের চিৎকার শুনেই লোকেরা এসে জড়ো হয়েছে বোধহয়। পাকসাট খেয়ে জানালার দিকে ধাবিত হল মুবারক। ছুরিটা ফেলে দিল ঘরের একধারে। জোহরা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে পিছন থেকে চেপে ধরল।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল মুবারক। তারপর জানালা টপকে কার্নিশে নেমে পড়ে অদৃশ্য হল। এদিকে জোহরা করনচন্দের উপরই পড়েছে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠছে ওর। জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল ধীরে ধীরে। দরজায় তখন প্রচণ্ড করাঘাত পড়ছে।

শেষে দরজা ভেঙে ফেলা হল।

হুড়মুড় করে কয়েকজন ঘরে এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন করনচন্দের ড্রাইভার। সে মালিকের আর্ত-চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে। ড্রাইভারের গলার আওয়াজই আগে পাওয়া গেল, হুজুর—সরকার—

সরকার তখন পরলোকে বেচারা বুঝতে পারছে না।

কে একজন বলে উঠল, কি সর্বনাশ! খুন!! পুলিশে খবর দাও—এখুনি পুলিশে খবর দাও।

যথাসময় কেস কোর্টে উঠল।

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে অনেক কথা পুলিশকে বলেছে জোহরা, কিন্তু সে সমস্ত কথা তারা বিশ্বাস করেনি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে জোহরার কথাকে বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পুলিশ আটঘাট বেঁধেই মামলা সাজিয়েছে।

সমস্ত অমৃতসরে আলোড়ন পড়ে গেল। কয়েকমাস ধরে মকদ্দমা চলল। অসংখ্য সাক্ষী নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। দু'পক্ষের আইনজ্ঞ কূট প্রশ্নে তাদের বিপর্যস্ত করে তুললেন। অভিজ্ঞ বিচারপতি মন দিয়ে সমস্ত শুনে গেলেন। ভ্রূ কুঁচকে প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলির উপর বার বার চোখ বুলিয়ে গেলেন। যথাসময়ে রায় দানের দিন উপস্থিত হল।

অনেক কথা বলার পর বিচারপতি বললেন, আসামীর উক্তি হয়তো সত্যি। হয়তো শেঠ করনচন্দকে হত্যা সে করেনি। কিন্তু আসামী নিজের সপক্ষে এমন কোন জোরাল সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি যা দিয়ে তার নির্দোষিতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। বিচারের ক্ষেত্রে ভাবাবেগের স্থান নেই। যে অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা প্রমাণিত হওয়ায় আসামীকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। আসামীর প্রথম অপরাধ ও বয়সের কথা বিবেচনা

করে শাস্তি স্বরূপ আমি তাকে মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্তে দ্বীপান্তরে অন্তরীণ থাকার আদেশ দিলাম।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দণ্ডাজ্ঞা শুনল জোহরা। মনের মধ্যেটা হু হু করে উঠলেও চোখ দিয়ে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল না। সব বোধহয় শুকিয়ে গেছে।

প্রহরীর সঙ্গে ও সেলের দিকে চলল।

* * *

কয়েক মাস কেটে গেছে।

রাত্রি তখন গভীর।

কম্বলের বিছানার উপর শুয়ে বিনিদ্র রয়েছে জোহরা। আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে। জীবনের কত দ্রুত পট পরিবর্তন হল। অমৃতসরের বিলাসীদের নর্মসহচরী জোহরা বাঈ কালাপানি পার করে এসে আজ পাথরে ঘেরা চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। খুন। সে খুনী!

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে খুনী, তার কোন বিচার হল না। মুবারক কোর্টে অম্লান বদনে বলল, সে নাকি সেদিন অমৃতসরে ছিলই না। গিয়েছিল লুধিয়ানা। এমন কি কয়েকজন সাক্ষীও পাওয়া গেল যারা লুধিয়ানায় মুবারকের সঙ্গে ছিল। বিচিত্র পরিহাস!

মুবারক এখন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঈজী পল্লীর অলিতে গলিতে। আর জোহরা—নিজের সমস্ত কিছুকে হারিয়েছে, এমন কি নিজের নামের প্রতি পর্যন্ত ওর কোন অধিকার নেই। এখানে দুটি সংখ্যায় ওকে উল্লেখ করা হয়। ঘুম আজকাল আর ওর হয় না। অবান্তর চিন্তা করেই রাত ভোর কেটে যায়। বাইরে একটানা সান্ত্রীদের চলাফেরার শব্দ আসছে। এই শব্দই জোহরার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়।

প্লেনের গুমগুম শব্দ পাওয়া গেল। যুদ্ধের নাকি খুব ঘোরাল অবস্থা। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ। একটি মেয়ে কয়েদী এখানে আছে তার মুখে জোহরা শুনেছে ইংরেজদের অবস্থা নাকি খুব খারাপ। ইউরোপ আর এশিয়া দুই মহাদেশে ঘাঁটির পর ঘাঁটি পত্তন হচ্ছে। এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপরও যে কোনও মুহূর্তে জাপানীরা বোমা ফেলতে পারে।

বোমা ফেললে বেশ হয়। এই পাথরের দেয়াল ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে পারে দূরে—অনেক দূরে—তারপর কোন রকমে সমুদ্র পেরিয়ে ভারতবর্ষে। জোহরার হাসি পেল, কত কি আবোল তাবোল ভাবছে ও। কিন্তু আজ যেন প্লেনের শব্দ বেশি হচ্ছে। যেন সারা আকাশ ছেয়ে গেছে আকাশযানে। তবে কি··

ওর চিন্তাস্রোতে প্রচণ্ড বাধা পড়ল। সেলের বাইরে সান্ত্রীদের দ্রুত আনা-

গোনার মধ্যে ওর ঘরের লোহার দরজা খুলে গেল। একজন সান্ত্রী দ্রুত গলায় বলল, বেরিয়ে পড় সেল থেকে। জাপানীরা এখুনি বোমা ফেলবে।

জোহরা কোন কথা না বলে দৌড়ে বেরিয়ে এল সেল থেকে। সংকীর্ণ প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে তখন অসংখ্য উন্মুক্ত কয়েদী মুক্ত প্রান্তরের দিকে ঠেসাঠেসি করে এগিয়ে চলেছে। জোহরার দম আটকে আসছে। বুম··· বুম···অবিরাম বোমা ফেলছে জাপানীরা। জেলখানার পাথরের দেয়াল থর থর করে কাঁপছে। এতক্ষণে বোধহয় ভেঙে পড়েছে কোথাও, কোথাও। ভিড়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে কোন রকমে এক সময় বাইরে এল জোহরা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু তখন চারদিকের অবস্থা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বোমারু বিমানে হাল্কা আলোকিত আকাশ ছেয়ে গেছে। ড্রাইভ কেটে কেটে তারা নীচে নেমে আসছে, আলোর ঝিলিক দেখা দিচ্ছে, তারপর গগন ফাটান বিরাট শব্দ। দলে দলে লোক মরণের কোলে ঢলে পড়ছে। কোথায় পালাবে জোহরা? ও বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবকাশ পেল না, কাছেই বিরাট শব্দে একটা বোমা ফাটল। জোহরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, আছড়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওর জ্ঞান লুপ্ত হল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল জোহরার জানা নেই। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখল ও একটা ক্যাম্প খাটের উপর শুয়ে আছে। ঘরখানা সুসজ্জিত। মাথার মধ্যে তখনও ঝিমঝিম করছে। তবুও মাথা তুলে ঘরের চারদিকে দেখল চেয়ারে বসে একজন জাপানী সিগারেট টানছে। তার সাজ-পোশাক দেখে মনে হয় কোন পদস্থ কর্মচারী। দরজার গোড়ায় সঙ্গীন উঁচিয়ে একজন জাপানী সান্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাপানীদের হাতে ধরা পড়েছে বুঝতে পেরেই জোহরা একেবারে মিইয়ে গেল।

ওর জ্ঞান হয়েছে লক্ষ্য করে অফিসারটি এগিয়ে এল ক্যাম্প খাটের কাছে। জোহরা আতঙ্কিত মুখে জড়বৎ পড়ে রইল। জাপানী অফিসার ভাঙা ইংরেজীতে প্রশ্ন করল, তোমার নাম?

জোহরার ইংরেজী জ্ঞান জাপানী অফিসারের মতই।

ও কোন রকমে বলল, জো—জোহরা—

—তোমার মতন সুন্দর মেয়েকেও ইংরেজরা জেলে পুরে রাখে! আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব। ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেব।

জোহরা কিছু বলল না। চুপ করে শুয়ে রইল।

—তবে দেশে গিয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ?

—এখন সে কথা থাক। রাত্রে আসছি আমি তোমার কাছে, তখন বলব। এখন তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।

কথা শেষ করেই অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কয়েক মিনিট পরেই খাবারের ট্রে হাতে করে আরেকজন জাপানী প্রবেশ করল।

গভীর রাত্রে সেই অফিসার জোহরার কাছে এল। দরজা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে। তার হিংস্র কুতকুতে মুখে লালসার হাসি। এগিয়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জোহরার উপর। জোহরা নিজেকে কোনক্রমে একটু সরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি আমায় কি একটা বলবেন বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, সেই ভাল। প্রথমে কাজের কথা শেষ করে নেওয়া যাক। জাপানী অফিসার সিগারেট ধরিয়ে বলতে আরম্ভ করল, ইংরেজরা শুধু আমাদের শত্রু নয়, তোমাদেরও শত্রু। প্রায় দুশো বছর তোমাদের পরাধীন করে রেখেছে। তোমরা স্বাধীনতা পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছো সে সংবাদ আমরা রাখি। জাপান ভারতকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু তার জন্যে জাপানকে সাহায্য করতে হবে ভারতীয়দের। তোমার মত সুন্দর মেয়েদের আমরা কাজের জন্যে বেছে নিয়েছি।

—কি করতে হবে আমায় ?

—বিশেষ কিছুই নয়। বম্বে বা কলকাতার মত বড় শহরে গিয়ে নিজের রূপের জোরে সামরিক পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তারপর তাদের কাছ থেকে কৌশলে সংবাদ সংগ্রহ করে ভারতে আমাদের যে এজেন্ট আছে তাকে জানাবে।

জোহরার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

—গুপ্তচরের কাজ ?

—হ্যাঁ। অবশ্য ভারতবর্ষে যাবার আগে তোমাকে টোকিওতে গিয়ে ছমাস ট্রেনিং নিতে হবে।

—কিন্তু···

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তুমি ভেবে দেখো। দুদিন ভাববার সময় দিলাম তোমাকে। যাক, কাজের কথা শেষ হল। এবার স্বচ্ছন্দে আমরা বাকী রাতটা মধুর করে তুলতে পারি।

লালসাঝরা চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসল জাপানী মেজর। রিভলবারের চামড়া আঁটা চওড়া বেল্ট খুলে রাখল ক্যাম্প খাটের উপর। দ্রুত চিন্তা করছে জোহরা। ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জীব, অতীত জীবনে অসংখ্য নোংরা কাজ করবার দৃষ্টান্ত রেখেছে। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করতে তবু সায় দিচ্ছে না মন। ওই সঙ্গে জাপানী পশুটার অঙ্কশায়িনী

হতেও মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। জোহরার মন অস্থির হয়ে উঠল এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। বেয়নেট ও রিভলবার আঁটা বেল্টের দিকে দৃষ্টি পড়ল এই সময়। একটা পরিকল্পনা যেন মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক মারল।

জোহরা খাট থেকে নেমে মেজরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেজর তখন নিশ্চিন্ত মনে ঝুঁকে বুটের পটি খুলছে। বুট পরে শোয়া যায় না। জোহরার দু'চোখ জ্বলছে, এই সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করা চলে না। ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেল্ট থেকে বেয়নেট খুলে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমূল বসিয়ে দিল মেজরের পিঠে। অস্ফুট শব্দ করে জাপানীটা গড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার নড়ে চড়ে স্থির হয়ে গেল। অত্যন্ত অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন চিৎকার করার অবকাশ পর্যন্ত পেল না।

কাজটা শেষ করে ফেলবার পরই রাজ্যের ভয় জোহরাকে গ্রাস করল। কি হবে এখন, সকলের চোখ এড়িয়ে কিভাবে এখান থেকে সরে পড়বে? খুন না করেই ওকে দ্বীপান্তরে আসতে হয়েছিল, আর দ্বীপান্তরে এসে নিজের হাত রক্তে রাঙা করে তুলল!

কোন রকমে নিজের ভীত ভাবকে দমন করে জোহরা জানালার কাছে সরে এল। সমুদ্রের কালো জল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গেল জোহরা। বাথরুমের ওপাশে মেথর আসবার দরজা। ওই দরজা খুলে বাইরে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন বাগান হবে বোধহয়। হাতড়ে হাতড়ে জোহরা এগিয়ে চলে। সৌভাগ্যক্রমে এদিকে কোন পাহারা নেই। দ্বীপটি সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হয়েছে, ইংরেজদের আর এখানে নামগন্ধ নেই বলেই বোধহয় সর্বত্র পাহারার কড়াকড়ি নেই।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল জোহরার সমুদ্রের তীরে পেঁছাতে। নারকেল গাছের সঙ্গে গা মিশিয়ে ও চারদিকে দেখতে লাগল। একপাশে অনেকগুলি দেশী নৌকা বাঁধা রয়েছে। বোমা পড়ার পর ভয়ে বোধহয় মাঝিরা পালিয়েছে কোথাও। নৌকা চালান সম্পর্কে কোন জ্ঞান জোহরার নেই। তবু একটা নৌকায় ও উঠে বসল। উত্তাল তরঙ্গের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও নৌকা ছেড়ে দিল। ভারতের মাটিতে পা দিতে পারবে না জানা কথা, সলিল-সমাধি অনিবার্য জেনেও জোহরা মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে গেল।

ঘটনাটা নাটকীয় বলতে হবে।

জোহরার সলিলসমাধি হয়নি। সেই রাত্রেই প্রায় ডুবন্ত নৌকা থেকে ওকে উদ্ধার করে স্পেনের একটি যাত্রীবাহী জাহাজ। স্পেনের সঙ্গে জাপানের কোন বিবাদ নেই, কাজেই জাহাজটির উপর বোমা পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। জাহাজটি আসছিল সিঙ্গাপুর থেকে, যাবে কলম্বো। নানা দেশের যাত্রীতে

পূর্ণ। একজন লস্করের প্রথম দৃষ্টি পড়ে জোহরার উপর। সে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারপর জোহরাকে তোলা হয় জাহাজে।

কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি পেটে পডতেই ও চাঙ্গা হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর করলেন। জোহরা অবশ্য সমস্ত সত্য কথা বলল না। বলল, বোমা পড়ার পর অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে ও বেরিয়ে আসে জেল থেকে। ঘুরতে ঘুরতে জেলেদের একটা নৌকা সংগ্রহ করে কোন রকমে। তাবপর ভেসে পড়ে সমুদ্রে। কথাগুলির মধ্যে অযৌক্তিকতা কম, কাজেই ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করলেন। কিন্তু তিনি সমস্যায় পডলেন জোহ্রাকে থাকতে দেওয়ার ব্যাপাবে। কারণ, কোন কেবিনই খালি নেই। অবশ্য অনেক ভারতীয় মহিলা আছেন জাহাজে, তাঁদের অনুরোধ করে দেখা যেতে পারে, যদি তারা কেউ নিজেদের কেবিনে জোহরাকে কলম্বো পর্যন্ত স্থান দেন।

ক্যাপ্টেনের অনুরোধে একজন রাজী হয়ে গেলেন। নিনা ভর্মার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। এই উত্তরযৌবনা মেয়েটি সিঙ্গাপুরের একটি রবার বাগানের অফিসে কাজ করত। কিন্তু এখন প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরছে। সে সাগ্রহে জোহরাকে নিজের কেবিনে স্থান দিল।

একদিন কেটে গেছে আরো।

জোহরার এখন প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে ফিরে কি করবে? আবার পুরানো জীবনে ফিরে যাবে? না, সেখানে আর যাবে না। অবশ্য একটা ভয়ও আছে, সরকার আবার ওকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাতে পারেন। কিন্তু ওতো জেল থেকে পালাতে চায়নি। ঘটনাপ্রবাহ এর জন্য দায়ী।

আজ সন্ধ্যার পর ডেকে বসে জোহরা নিজের মনস্থির করে ফেলেছে।

উত্তর-ভারতের এক বড শহরে, এক হোটেলের তরুণ মালিক চলেছেন এই জাহাজে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে জোহরার। ও ভাল নাচতে গাইতে জানে শুনে তিনি নিজের হোটেলে ওকে চাকরি দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। ওই চাকরিই জোহরা গ্রহণ করবে। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ক্রমে ডিনার টাইম হয়ে এল। জোহরা কেবিনে ফিরে এল নিনাকে ডেকে নিতে ডাইনিং হলে যাবার জন্যে। নিনা কিন্তু কেবিনে ছিল না। আগেই গেছে তাহলে। জোহরা কেবিনের আলো না জেলেই সংলগ্ন বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলে যাবে। ও বাথরুমে প্রবেশ কববার পরই নিনা এল। তার কেমন সচকিত ভাব। দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। আলো জ্বালল। সে জোহরার উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিনা কেবিনের আলো জ্বালার পর এক বিচিত্র কাজ করল। একপাশে রাখা বক্স গ্রামোফোনটা বিছানার উপর নিয়ে এসে চাবি দিয়ে তার ডালা খুলল। ডালা

খোলার পর কিন্তু তাকে আর গ্রামোফোন বলা গেল না—শক্তিশালী পোর্টেবল ওয়ারলেস যন্ত্র।

নিনা যন্ত্রের চাবি ঘোরাল। অপর প্রান্ত থেকে গলা ভেসে এল, টোকিও—

NN—NN—

—NN কথা বলছি। একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। ভারতবর্ষে তাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে বলে মনে হয়।

—তাড়াতাড়ি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও। NN একটা সংবাদ নোট করে নাও। আন্দামানে আমাদের একজন অফিসারকে হত্যা করে জোহরা নামে একটি মেয়ে পালিয়ে গেছে। হয়তো তোমাদের জাহাজেই উঠেছে। তার সন্ধান করে দেখবে।

সংবাদ শুনে নিনা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জোহরা !!!

—আমি যে মেয়েটির নাম বললাম তার নামও জোহরা।

—সেই মেয়েটি হয়তো। চোখে চোখে রাখো তাকে। কোন রকমে কাছ ছাড়া করা চলবে না তাকে। খবর শেষ।

লাইন কেটে গেল।

ওদিকে বাথরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে জোহরা। বাথরুম থেকে বেরুতে যাবার মুহূর্তে ও নিনার কার্যকলাপ দেখে ফেলেছে। সমস্ত কথা শুনতে না পেলেও টোকিও কথাটা কানে এসেছে। ও বুঝতে পেরেছে নিনা জাপানী গুপ্তচর। বাথরুম থেকে না বেরিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করেছে এতক্ষণ। নিনা তখনও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি। আলো জেলে কি যেন লিখছে। লেখা শেষ হলে, সে বাথরুমের দিকেই এগিয়ে এল। আর আত্ম-গোপন করে থেকে লাভ নেই।

জোহরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে নিনা ভীষণভাবে চমকে উঠল। তারপর কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, তুমি বাথরুমে ছিলে ?

—হ্যাঁ। চল, খেয়ে আসি।

—দাঁড়াও। একটা কথা জানবার আছে। তুমি আন্দামানে একজন জাপানী অফিসারকে খুন করে এসেছো ?

এই অভাবনীয় প্রশ্নে চমকে উঠল জোহরা। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নিনার দিকে। দুজোড়া চোখেই উত্তেজনা দমন করবার প্রবল চেষ্টা। কয়েকটা মিনিট সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

জোহরা বলল, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি জানতে চাই তুমি কি জাপানী গুপ্তচর ?

—না।

—মিথ্যে কথা বল না। ওই বক্স গ্রামোফোনের মধ্যে কি আছে আমি

জানি। কথা বলতেও শুনেছি। আমি আর এ কেবিনে থাকব না। ক্যাপ্টেনকে গিয়ে···

জোহরার কথা শেষ হল না। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে নিনা বলল, আর এক পা কেবিনের বাইরে যাওয়া চলবে না তোমার। চেঁচামেচি করবার চেষ্টা করলে এখুনি আমি তোমায় গুলি করে মারব। জাহাজে আমি একলা নেই। আরো দশজন লোক আছে আমার দলের।

নিনা বেল বাজাল।

একজন ভৃত্য এল কেবিনে।

—তেইশ নম্বর কেবিন থেকে মিঃ টমসনকে ডেকে দাও '

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশালদেহী টমসন এল। বোধহয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। চাপা গলায় তাকে কি বলল নিনা। টমসন একবার আপাদমস্তক দেখে নিল জোহরাকে। এগিয়ে গেল। জোহরা কিছু বুঝতে পারার পূর্বেই ওর কাঁধে ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখল জোহরা। সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

টমসন তাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। নিনা ততক্ষণে অ্যাম্পুল ও ইনজেকসনের সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছে। অ্যাম্পুলের ওষুধ হাতে ইঞ্জেক্ট করল টমসন। এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। বাকী কটা দিন জাহাজে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল জোহরা। সকলে শুনল, ও নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কলম্বোতে নামার পর কিভাবে যে তাকে বম্বেতে আনা হয়েছিল জোহরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু তখন আর এদের হাত থেকে ছাড়া পাবার উপায় ছিল না। একটু বেচাল দেখলেই তারা ওকে গুলি করে মারবে। এই সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে এখুনি যেতে চায় না জোহরা। আরো কিছু দিন বেঁচে থাকতে চায়।

নিনা বলল, যে তোমাকে চাকরি দেবে বলেছিল, সেই হোটেল মালিকের কাছে চলে যাও। উত্তর-ভা তে এতবড় হোটেল আর নেই। সব সময় হোমড়া-চোমড়া অতিথিদের আগমন হয়। ওখানে থাকলে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু চালাকি করবার চেষ্টা করো না। আমাদের লোক সব সময় তোমাকে পাহারা দেবে। একটু এদিক ওদিক দেখলেই···

নিনা আর কথাটা শেষ করল না। অর্থ পরিষ্কার।

জোহরা উত্তর প্রদেশের সেই শহরে চলে গেল। হোটেলের তরুণ মালিকটি সাদরে গ্রহণ করলেন ওকে। চাকরি হয়ে গেল। ওর কাজ হল, সন্ধ্যার আসরে নেচে গেয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা। সে কাজ সুচারুরূপে ও সম্পন্ন করতে লাগল। অল্প দিনের মধ্যেই জোহরা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। জলের স্রোতের মত উপহারের স্রোত আসতে লাগল ওর কাছে। অনেক গণ্য-

মানা ব্যক্তি ওর সঙ্গসুখ লাভের জন্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করলেন। এই অবকাশে জোহরাও নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। সংবাদগুলি লিখে খামে মুড়ে রেখে দেয়, সকলের চোখ বাঁচিয়ে টমসন এসে নিয়ে যায় খাম।

এদিকে আরেক ব্যাপার ঘটে গেছে। হোটেলের মালিক রায়না জোহরার প্রেমে পড়ে গেছে। জোহরাও তাই চেয়েছিল। ওর বহুদিনের স্বপ্ন এইভাবে সফল হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবে রায়না যদি ওকে বিয়ে করে! কিন্তু ওর যে দ্বীপান্তর হয়েছিল -ও যে এখন জাপানী গুপ্তচর—রায়না যদি এ সমস্ত কথা জানতে পেরে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদি···না, ভবিষ্যতের কথা বর্তমানে ভাববে না জোহরা। মনের মধ্যে যে কল্পনার সৌধ রচনা করেছে তা এখনই ভেঙে দেবে না।

রায়না একদিন ওকে প্রশ্ন করল, তোমার কাছে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রায়ই আসে সংবাদ পেয়েছি। লোকটা কে?

মিষ্টি হেসে জোহরা বলল, তোমার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি রহিমদের সঙ্গে মেলা-মেশা করি। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তো নেই। তুমি ভুল সংবাদ পেয়েছো।

—তাই হবে। মোট কথা আমাকে তুমি প্রতারিত কর তা আমি চাই না।

—প্রতারণা! কি যে বল!!

রায়নার বুকের উপর এলিয়ে পড়ল জোহরা।

কিন্তু শেষরক্ষা করা সম্ভব হল না। সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ হয়ে গেল। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল জোহরা। তখন অর্ধেক রাত। টমসন এসেছিল সংবাদের খাম নিয়ে যেতে। এমন সময় দরজায় করাঘাত।

—কে—

—আমি রায়না। দরজা খোল।

আতঙ্কের বন্যা এল ঘরে। দ্বিতীয় কোন দরজা নেই। হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতেই হবে। কোন অজুহাতেই রায়নার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। টমসন নিজের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। সে পকেট থেকে একটা শিশি বার করল। গাঢ় সবুজ বর্ণের তরল পদার্থ রয়েছে তাতে।

দৃঢ় গলায় বলল, এটা নিজের গলায় ঢেলে নাও।

একটু ইতস্তত করে শিশিটি নিজের মুখে উপুড় করে দিল। টকটক স্বাদ অনুভব করল। টমসন তখন নিজের ডান হাতে ধরা রিভলবার দিয়ে ইঙ্গিত করল দরজা খুলে দিতে। জোহরার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে আরম্ভ

করেছে। ও দরজা খুলে দিল। রায়না ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে টমসন বলল, দরজা বন্ধ করুন। আপত্তি করবার চেষ্টা করবেন না। আমার হাতে রিভলবার আছে। টমসনের হাতের রিভলবারের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রচালিতের মত দরজা বন্ধ করে দিল।

অসংলগ্ন গলায় বলল, কে—কে তুমি —

—জোহরার প্রণয়ী আমি নই। শুনুন, আপনার মনের মানুষটি সাধারণ বস্তু নয়। একজন জাপানী গুপ্তচর।

—গুপ্তচর!

—হ্যাঁ। আপনি অজান্তেই কতখানি ঝুঁকি নিয়েছেন বুঝতে পারছেন। সে যাক। তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এখন একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।

কাঁপা গলায় রায়না বলল, কি কাজ ?

টমসম নিজের পকেট থেকে ছোরা বার করে টেবিলের উপর রাখল। তরল পদার্থের গুণে জোহরা তখন উপুড় হয়ে বিছানার উপর পড়েছিল।

—মেয়েটার পেটে যা গেছে তাতে অবশ্য সে ঘণ্টা সাতকের মধ্যে মারা যাবে। তবে মূর্ছাভিঙ্গ হবার পরই অনেক গুপ্ত কথা আপনাদের বলে দিতে পারে। মারা যাবার আগে সে কিছু কথাবার্তা বলে যাবার সময় পাবে। কিন্তু আমি তাকে সে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে দিতে চাই না। ছোরাটা তুলে নিয়ে ওর ঘাড়ে বসিয়ে দিন।

টমসনের কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেল রায়না। বন্ধ দরজার দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই টমসন সেখানে পেঁছে গেছে।

—আমার রিভলবারে সায়লেন্সার লাগান আছে মিঃ রায়না। ছেলেমানুষি না করে ছোরাটা তুলে নিন। যান, এগিয়ে যান টেবিলের কাছে।

রাত তখন সাড়ে তিনটে।

টাউন থানার অফিস ঘরে দুজন সাব-ইন্সপেক্টর ঘুম-জড়িত চোখে কথা বলছিলেন। টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। একজন রিসিভার কানের কাছে নিয়ে এলেন, হ্যালো—

অপর প্রান্ত থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'হোটেল গ্রীনে' চলে আসুন। সেখানে একজন মহিলা খুন হয়েছেন। হত্যাকারী হোটেলের মালিক নিজেই।

—খুন! আপনি কে ?

—আমার পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি ? তবে এইটুকু জেনে রাখুন, হত্যাকাণ্ডের সময় আমি সেই ঘরে উপস্থিত ছিলাম।

লাইন কেটে গেল।

কেমন লাগল গল্পটা ?

তোমরা হয়তো ভাবছো এটা কোন কেচ্ছা-কাহিনী নয়। জোহরার মত মেয়ের বেঁচে থেকে লাভ কি ? তারা সংখ্যায় যত কমে যাবে সমাজের ততই কল্যাণ। ভালই করেছে টমসন। সে বরং আরো দু-চারটে জোহরার মত মেয়েকে মেরে ফেলুক।

তোমাদের চিন্তা-ভাবনা সময় সময় আমার হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। সমাজের কল্যাণের কথা সত্যিই কি তোমরা কখনও ভাব ? আমি দীর্ঘদিন এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছি, হানাহানি, দুনীতি আর ব্যাভিচার নিয়েই তোমরা আছো।

অল্প কয়েকটি নয়—তোমাদের স্বভাবের অনেক কাহিনী জানি। ধৈর্য ধরে শুনতে চাইলে একে একে বলব সবই। আবার আরম্ভ করি তাহলে ?

১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর।

বেলা বারোটার পর ডোমেরা ধরাধরি করে নিয়ে এল একটি মৃতদেহ। দেহটি অনিন্দ্যসুন্দরী এক নারীর। বয়স ত্রিশের কোঠা পার হয়নি এক নজরে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ব্লাউজ ও সায়ার মাঝামাঝি বেশ কিছুটা স্থানে গাঢ় রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে। বুলেটের ক্ষতও চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য রক্তের উৎস ওখান থেকেই।

এইরকম অনিন্দ্যসুন্দরীরাও খুন হয়, ভাবতেও বিশ্রী লাগে আমার। গুলি চালাতে মায়া হয় না মানুষের ? একটুও হাত কাঁপে না, এই অপরূপ সৌন্দর্যকে চিরতরে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে ? তাকে শোয়ান হল আমার বুকের ওপর। ডাঃ গুহ আর ডাঃ সরকার এগিয়ে এলেন। আমার কাছে ঘন হয়ে এল কয়েকজন চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র।

এবার কাটা-ছেঁড়ার পালা আরম্ভ হবে।

দিন দুয়েক পরে সমস্ত ঘটনাটা শুনলাম। আমার আক্ষেপ সম্পূর্ণ মাঠে মারা গেল। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের শিকার হয়নি মেয়েটি। এমন কি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল বলে তার নিজের কোন লোক রাগ সামলাতে না পেরে যে গুলি চালিয়েছে, তাও না। মেয়েটি 'মেলভ্যান' লুঠের সঙ্গে যুক্ত—পুলিশের গুলিতেই সে মারা পড়েছে।

এই কেসের সঙ্গে যুক্ত পুলিশপ্রধানের কাছ থেকেই সমস্ত ঘটনাটা জেনেছিলেন ডাঃ গুহ। কথা প্রসঙ্গে আজ তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েই সেই লোমহর্ষক কাহিনীটি ডাঃ সরকারকে বললেন। লক্ষ্য করেছি, যে-কোন বিষয় অত্যন্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে বলার চমৎকার ক্ষমতা ডাঃ গুহর আছে।

তিনি যা বললেন, তাই এবার বলি—

নিয়মিত যেমন আসে, সেদিনও বক্সার স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ করেছিল যথাসময়। যাত্রীদের ওঠানামায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্টেশন। শুধু মেলভ্যানের দরজা খোলেনি। এইভাবে দরজা বন্ধ দেখে স্টেশনে অপেক্ষমান ডাক কর্মচারীরা স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত। ট্রেন স্টেশনে পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা না খুললে ডাকের থলি বিনিময় হবে কিভাবে ?

বিস্ময়েব বিষয়, প্রচুর ডাকাডাকি ও ধাক্কা-ধাক্কি করেও দরজা খোলান গেল না। কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো ? এদিকে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। একজন ছুটে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে সংবাদ দিল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি এলেন ঘটনাস্থলে, অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি অবাক। তাঁর দীর্ঘ চাকরি-জীবনে এ রকম ঘটনার অবতারণা আর কখনও হয়নি।

তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে রেল পুলিশকে সংবাদ দিলেন। হৈ-চৈ পড়ে গেল স্টেশনে। কাতারে কাতারে লোক মেলভ্যানের সামনে এসে অর্থহীন চিৎকার আরম্ভ করে দিল। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম কবে যাবার পরও ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যেতে পারল না। প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন যাত্রীকে সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করে, তাঁদের সামনে কামরার দরজা ভেঙে ফেলা হল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে তিনটি মৃতদেহ। সমস্ত মেলভ্যান কারা তচনচ করে দিয়েছে। মূল ট্রেন থেকে ঐ বগি আলাদা করে নেওয়া হল। ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করে দেখা হল ইন্সিওর ইত্যাদি খোয়া গেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার।

জোর তদন্ত চলল। কিন্তু কোন আশার আলো দেখতে পাওয়া গেল না। চলন্ত এবং বন্ধ মেলভ্যানের মধ্যে যেন ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। কর্তারা চিন্তিত হলেন। রেল পুলিশ আর স্থানীয় থানা ইনচার্জের উপর এই জটিল কেস ফেলে রাখা যায় না। রাজধানী থেকে গোয়েন্দা-বিভাগের সুবিখ্যাত পুরুষ রণবীর রাইকে আনান হল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি তদন্তের কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রধান চিন্তা হল, বন্ধ মেলভ্যানের মধ্যে হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা ঢুকেছিল কিভাবে ? অবশ্য অচিরেই তিনটি সম্ভাবনা তাঁর মনের মধ্যে আকার নিল। এক—ট্রেন ছাড়ার মুখে হয়তো একজন এসে বলেছিল, ভীষণ ভিড় কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। এখানে দাঁড়িয়ে একটা স্টেশন চলে যাব। মেলভ্যান কর্মীরা তাকে দয়া করে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছিল। দুই—হত্যাকারীও হয়তো ডাককর্মী। কাজেই মেলভ্যানের দরজা খুলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে তাদের অসুবিধা হয়নি। তিন—হত্যাকারীদের কারুর সঙ্গে মেলভ্যানকর্মীদের কারুর হয়তো আত্মীয়তা ছিল। কাজেই আত্মীয়টি নিজের দু-একজন সঙ্গী নিয়ে সহজেই ঢুকতে পেরেছিল কামরায়।

এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে হত্যাকারীরাও ডাককর্মী ছিল, এই কথাই যেন বেশি মনে ধরছে। খুন করে ও মাল নিয়ে তারা নিশ্চয় পরের স্টেশনে নেমে যায়। যাবার সময় কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেলভ্যানের দরজা বাইরে থেকেই আটকে দেয়। সুতরাং মোগলসরাই-এ অনুসন্ধান চালালে কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কারণ ওখান থেকেই ইন্সিওরগুলি বুক হয়েছিল। হত্যাকারীরা যদি ডাককর্মী হয় তাহলে তারা সেই বিভাগে কাজ করে যেখান থেকে বুঝতে পারা যায়, কোনদিন কি কি মূল্যবান জিনিস বুক হওয়ার পর কোন ট্রেনে যাচ্ছে। গোপনে অনুসন্ধান চালাবার পর বড রকম একটি সূত্র পাওয়া গেল। মোগলসরাই ডাকবিভাগের মেল ব্রাঞ্চের দুজন কর্মী মেলভ্যান লুঠ হবার পরের দিন থেকে অফিসে অনুপস্থিত। তাদের নাম, রায়না ও চমকলাল। দুজনকে কিন্তু বাড়িতেও পাওয়া গেল না। কয়েকদিন থেকে তারা নিজেদের বাড়িতেও যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে, দুজনেব পানদোষ আছে। অভ্যাস আছে খারাপ পল্লীতে যাতায়াতের। এই দুজনকে যদি অপরাধী বলে ধরে নেওয়া যায় এবং তারা অন্যত্র যদি পালিয়ে না গিয়ে থাকে তবে ঐ কদর্য পল্লীতেই তাদের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রণবীর রাই পতিতা স্ত্রীলোকদের পাড়ার একটি হোটেলে আশ্রয় নিলেন। তিনি দিল্লীর লোক। পুলিশ কর্মচারী হিসেবে তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না এখানে। হোটেলের মালিক একজন বাঙালী। আগে কাঠের ব্যবসা করতেন, এখন হোটেল খুলেছেন।

হাসতে হাসতে রাই বললেন, কাঠের ব্যবসা থেকে একেবারে হোটেলের ব্যবসা ?

মালিক-কাম-ম্যানেজার দানতোষবাবুও সহাস্যে বললেন, ভাগ্যচক্র। বুঝলেন মশাই, ভাগ্যের চাকা যে কার কোনদিকে ঘুরবে কেউ বলতে পারে না। কাঠের ব্যবসা চলল না। কি করব ভাবছিলাম, এক বন্ধু এই বাড়িখানার সন্ধান দিলেন। কি খেয়াল হ'ল বাড়িটা ইজারা নিয়ে হোটেল ব্যবসা ফেঁদে বসলাম।

—পাড়াটা কিন্তু বিশেষ ভাল নয়।

—ভাল নয় বলেই তো হোটেল চলছে। আপনার মত ভদ্রলোক এখানে আসেন ক'জন। সস্তায় যারা মজা লুটতে চায় তারাই হল এখানকার বোর্ডার।

রাই ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, আমাকে যতটা দুধপোষ্য ভাবছেন আমি কিন্তু ততটা নই···ইয়ে·· মানে···যাওয়া-টাওয়া আমারও অভ্যাস আছে।

—তাই নাকি ? এতে লজ্জা পাবার কি আছে ? যেতে যদি চান, জাভেরি বাঈ-এর কোঠায় চলে যান।

—জাভেরি বাঈ বেশ মনের মত হবে বলছেন ? চলুন না, দুজনে একসঙ্গে

যাওয়া যাক। দানতোষবাবু জিভ কেটে বললেন, ঐসব দিকে নজর দিলে কি এখানে ব্যবসা করা যায়? আপনি যান, যাকে বলবেন সেই তার কোঠা দেখিয়ে দেবে।

সেইদিনই আরেক কাণ্ড ঘটল।

চমকললাল ও রায়নাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ঐ পাড়াব খয়েরি বাঈ নামে একটি মেয়ের ঘরে বসে ওরা গান শুনছিল আর নোট ছড়াচ্ছিল। রণবীর রাই ওদের মুখোমুখি হলেন না। জেরা করলেন স্থানীয় থানা ইনচার্জ। উনি আড়াল থেকে শুনলেন।

ঘাবড়ে গেলেও প্রশ্নের উত্তর দিল ওরা বেশ সপ্রতিভভাবে। মেলভ্যান লুঠের দিন ওরা নাকি বেনারস গিয়েছিল। দুজন পাণ্ডা সাক্ষী আছে। অবশ্য ছুটি নিয়ে যায়নি এটা তাদের নিশ্চয় অপরাধ। তারা কম মাইনে পায় ঠিকই—নিজেদের জমির আয়ের টাকা যদি খয়েরি বাঈয়ের পিছনে খরচ করে, এতে পুলিশের কি বলবার থাকতে পারে ইত্যাদি।

রাই থানা ইনচার্জকে ডেকে বললেন, ওদের ছেড়ে দিন। ওদের মুখ থেকে কাজের কথার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে না। বরং দুজনের পিছনে ফেউ এর মত আমাদের লোক লেগে থাকলে সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

তাই করা হল।

আরো একদিন কেটে গেছে।

রাই দানতোষবাবুর সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, খয়েরি বাঈ মেয়েটি কেমন?

—কেন, যাবেন নাকি ওর কাছে? জাভেরিকে বুঝি ভাল লাগল না?

—মানে·· মুখ বদলাতে দোষ কি?

—তা বটে। কানপুর থেকে এসেছে মাস ছয়েক হল। মেয়েটার ভাগ্য খুব ভাল মশাই, এসেই পসার জমিয়ে ফেলেছে। এই হোটেলেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় রইসদের সঙ্গে। তবে—

—থামলেন যে?

—এখন বোধহয় আপনি ওখানে সুবিধা করতে পারবেন না।

—কেন?

—চমকলাল আর রায়না নামে দুটো ছোঁড়া টাকার বেড়া দিয়ে মেয়েটাকে ঘিরে রেখেছে।

রাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে সত্যিই সুবিধা হল না। এত টাকার জোর আমার নেই।

* * *

রাত তখন দশটা।

হৈ-হল্লা আর গালাগালির ফোয়ারায় মুখরিত সমস্ত পাড়া। কোঠায় কোঠায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। নূপুরের রিমঝিম শব্দ ভেসে আসছে। সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে রাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভিড়ের মধ্যে। তাঁর এই ঘোরাঘুরি চলছে দুঘণ্টার ওপর। একসময় ক্লান্তি অনুভব করে হোটেলের দিকে ফিরলেন।

কিছুটা অন্ধকার অংশ পার হতে হয়। হোটেলের কাছ বরাবর এসেছেন। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে থামলেন। কথা বলছে চমকলাল। অন্ধকার থাকায় কিছুই দেখতে পেলেন না। উৎকর্ণ হলেন।

—তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ বটে, কিন্তু…

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তীক্ষ্ন গলায় একটি মেয়ে বলল, নিজের পায়ে তুমি নিজেই কুড়ুল মেরেছো। অন্ততঃ মাসদুয়েক এ পাড়ায় তোমার যাওয়া-আসা উচিত নয়।

—পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েও তো আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

—ছেড়ে দেয়নি। চার ফেলেছে। আর বোকার মত এ পাড়ায় এসো না। মন দিয়ে কাজকর্ম কর কিছুদিন।

—আমার পাওনার কি হবে?

—পাবে। এবার কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে শেষ পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেওয়া হবে। এবার আমি যাই। বড়লোকের একটা বোকা ছেলেকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

আর কথাবার্তা হল না। পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রাই পাঁচিলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওরা চলে যাবার পর চিন্তিত মনে হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এল না। নানা কথা ওঠানামা করতে লাগল মনের মধ্যে। পরিকল্পনাও দানা বাঁধল।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণবীর রাই থানায় গেলেন। থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ও, সি-র কোয়ার্টার। তিনি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। খবর পেয়েই ছুটে এলেন।

রাই কোনরকম ভূমিকা না করে প্রশ্ন করলেন, রায়না ও চমকলাল অফিসে যাওয়া-আসা করছে কি?

-ওরা নিয়মিত অফিসে যাচ্ছে।

—একটা কাজ আপনাকে করতে হবে ইন্সপেক্টার।

—বলুন স্যার।

—ডাকবিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, হাজার চল্লিশেক টাকার ভুয়ো ইন্সিওর পাঠাবার ব্যবস্থা দিন দুয়েকের মধ্যেই আপনাকে করতে হবে। আইনের

বাইরে পা বাড়াতে হচ্ছে অবশ্য—কিন্তু এইভাবে টোপ না ফেললে ওদের গেঁথে তোলার আর কোন উপায় দেখছি না।

—আপনার কথামতই কাজ হবে। আইনের বাইরে হলেও, ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা করবেন ভরসা করি।

—এখন আমি উঠলাম। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর আমাকে সংবাদ দেবেন। বাই দি বাই, আপনাকে একটা ইনফরমেশন দিয়ে যাই, ওদের দলে একটি মেয়েও আছে।

•

ওরা যে টোপ গিলবে এ সম্পর্কে রণবীর রাই নিশ্চিত ছিলেন। এই নিশ্চয়তার নেপথ্যে জোরালো যুক্তিও আছে। সেদিন অন্ধকারে মেয়ে-পুরুষের আলোচনার মধ্যে একটি কথা তাঁর মনে ঘা দিয়েছিল। চমকলালের প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, এবার কার্যোদ্ধার হবার পর শেষ পয়সাটিও মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই কর্যোদ্ধার কথাটি হল আসল মূলধন। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচেছ ওরা আরেকবার বড় রকমের কোন দুষ্টকর্ম করতে চায়। স্বাভাবিক-ভাবেই ধরে নেওয়া চলে, আবার হয়তো মেলভ্যান লুঠের পরিকল্পনা আছে। নিজেদের অপরাধকর্মের প্যাটার্ণ অপরাধীরা সহজে বদলায় না।

তাই টোপ ফেলতে হয়েছে। রায়না ও চমকলাল সহজেই জানতে পারবে অমুক দিন মোটা টাকার ইন্সিওর যাচ্ছে। খবর চলে যাবে দলের অন্যান্যদের কাছে। দলপতি নিশ্চয় একজন আছে। সে দলবল নিয়ে কাজে নেমে পড়ার লোভ সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না।

আজ সেইদিন।

মোগলসরাই-এর পরের প্রত্যেক ছোট-বড় স্টেশনে সাধারণ পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যদি লুঠ হয়, কোন্ স্টেশনে হবে পূর্বাহ্নে অনুমান করা সম্ভব নয়। রাত একটা বেজে গেল, এখনও পর্যন্ত কোনরকম গোলমালের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ভাবুয়া রোড ছোট স্টেশন।

ওখানেও জনদশেক কনস্টেবল পাহারায় রয়েছে। তাদের ইনচার্জ হল দিলদার। দিলদার সিং তরুণ ইন্সপেক্টার। সে ভ্রূ কুঁচকে পায়চারি করছে সুরকি-ঢালা প্ল্যাটফর্মের ওপর। এই সমস্ত পণ্ডশ্রমের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না সে। এদিকে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। অবশ্য রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে থাকতেই হবে। শেষ মেলভ্যানবিশিষ্ট ট্রেন ঐসময় ভাবুয়া রোড় অতিক্রম করে।

জনবিরল স্টেশন।

ট্রেনের সময় হয়ে এল। দু-চারজন যাত্রী দেখা দিলেন। আলো দেখতে

পাওয়া গেল দূরে; তারপর প্রবল গর্জন তুলতে তুলতে যন্ত্রদানব এসে পড়ল স্টেশনে। নিজের দৃষ্টি তীক্ষ্ন করল দিলদার। মেলভ্যানের দরজা খুলে গেল। ডাক-কর্মীরা থলে আদান-প্রদান করল। ঠিক এই সময়—। বলতে গেলে ঘটনাটা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কোথা থেকে জনকয়েক লোক ছুটে এল। দুজন ঢুকে গেল মেলভ্যানের ভেতরে। বাকিরা প্ল্যাটফর্মে কর্তব্যরত ডাক-কর্মীদের ঘায়েল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্তম্ভিত দিলদার কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে চলল নিজের লোকদের নিয়ে।

বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না তার পক্ষে। এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। ছিটকে পড়ল দিলদার। তার বাঁ-হাত জখম হয়েছে। গুলির আওয়াজে যাত্রীরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। বলা বাহুল্য এই গোলমালের মধ্যে আক্রমণকারীরা কাজ গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে স্টেশনের এ. এস, এম-ও একজন। তিনি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মোগলসরাই-এর সঙ্গে সংযোগ করলেন। ওখানকার কর্তাদের জানালেন সব কথা। পরিশেষে বললেন, তারা মোটরে চেপে চম্পট দিয়েছে। কাপড় দিয়ে সকলের মুখ ঢাকা থাকায় কাউকে চেনা যায়নি। তবে দলের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল বুঝতে পারা গেছে।

মোগলসরাই স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন রণবীর রাই। সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবেই এই গুরুতর সংবাদ তিনি গ্রহণ করলেন।

বললেন, দেখা যাচ্ছে আমার টোপ ওরা গিলেছে। এখন আমাদের আসল কালপ্রিটকে খেলিয়ে তুলতে হবে ইন্সপেক্টার। ভাল কথা, এখান থেকে ভাবুয়া রোডের দূরত্ব কত?

—চল্লিশ মাইলের কিছু ওপর।

—মোটরে ওরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাবে মনে হয়।

—আমারও তাই ধারণা। আমি তো আর কোন ঘোরপ্যাঁচ দেখছি না। ওদের সঙ্গে যে মেয়ে রয়েছে সে খয়েরি বাঈ ছাড়া আর কেউ নয়। তার কোঠাতেই শেষরাত্রে সব ক'টাকে চোরাই মালসমেত পাওয়া যাবে।

রাই কিছু বললেন না।

● ● ●

সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

খাঁ খাঁ করছে নিশুতি রাত্রি।

খোলার ঘরগুলোর আড়ালে রাই, ইন্সপেক্টার ও কয়েকজন কনস্টেবল এগিয়ে চলেছে। ওরা ঘন্টাখানেক ধরে নোংরা পল্লীর মুখে আত্মগোপন করে

দাঁড়িয়েছিল। লুঠের মাল নিয়ে এখনও দুর্বৃত্তদের ফিরতে দেখা যায়নি। রাই-এর নির্দেশে এতক্ষণে সকলে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ ইন্সপেক্টার বললেন, খয়েরি বাঙ্গি-এর কোঠার কাছাকাছি আমাদের এখন থাকা উচিত।

রাই বললেন, ওরা ফিরে এসে ওখানে নাও যেতে পারে। তার চেয়ে আসুন, এই মোটা গাছটার আড়ালে দাঁড়ান যাক। এখানে দাঁড়ালে এ পাড়ার অনেক দূর অবধি দৃষ্টি যাবে, তাছাড়া হোটেলের বাউণ্ডারি-ওয়াল আমাদের পিছন দিকের প্রোটেকশন দেবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, দূরে মোটরের হেডলাইট দেখা গেল। দ্রুতস্পন্দন আরম্ভ হল সকলের বুকের মধ্যে। গাড়ি কিন্তু ধুলো উড়িয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল না। থামল গজ কুড়ি ওধারেই। গাড়ি থেকে নামল তিনজন লোক। দুজন পুরুষ আর একজন নারী। গাড়িতে আরো লোক ছিল। তাদের নিয়ে গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

দ্রুত পায়ে তিনজন এগিয়ে আসছে। তিনজনের হাতে তিনটে ব্যাগ। ইন্সপেক্টার উত্তেজনার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। রণবীর রাওও যে উত্তেজনা বোধ করছে না তা নয়। দূরত্ব অনেক কমে এসেছে—এইসময় আরেকটি ঘটনার অবতারণা হল। সাইকেল চেপে চতুর্থ আগন্তুকের আগমন হল সেখানে। সে তিনজনের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

একজন চাপা রাগত গলায় বলল, একি তুমি! কি চাই তোমার?

—বুঝতে পাচ্ছো না, পাওনার জন্য এসেছি।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাওনার কথা হয় না চমকলাল। এখন যাও। পাওনার কথা কাল হবে।

—অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই। ভেবেছো কিছুই বুঝতে পারি না? আমাকে ফাঁকি দেওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য। রায়নাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে। অথচ আমাকে জানাওনি পর্যন্ত। আমার সঙ্গে আর চালাকি করবার চেষ্টা করলে চেঁচিয়ে লোক জড়…

কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড ঘুঁষিতে একজন তাকে ধরাশায়ী করল। তারপর প্রায় জ্ঞানহীন চমকলালের দেহটা তুলে নিল কাঁধে। আবার তিনজন এগিয়ে চলল। কাছাকাছি হতেই রাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। গোটাকয়েক টর্চ ঝলসে উঠল।

—শেষরক্ষা করতে পারলেন না দানতোষবাবু।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন দানতোষবাবু। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন তীক্ষ্ন গলায়—এ সবের অর্থ কি?

—হোটেলের ব্যবসার আড়ালে মেল-লুঠের কারবারটা ভালই চালিয়েছিলেন। আমায় পুলিশের লোক জানলে বোধহয় থাকবার জায়গাও দিতেন না, কি বলেন ?

ইন্সপেক্টার, হত্যা ও লুঠের অপরাধে দানতোষবাবু আর তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করতে পারেন। ঐ ব্যাগগুলোতে সদ্য লুঠ করা মালের সন্ধান পাবেন। এই মেয়েটি সম্পর্কে আপনি ভুল ধারণা নিয়েছিলেন, এ খর্মোর নয়—এ হল দানতোষবাবুর প্রণয়িণী জাভেরি বাঈ।

এইসময় এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হল।

দানতোষবাবু নিজের হাতের ভারি ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলেন—রণবীর রাই-এর হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল। তিনি কোন রকমে টাল সামলে নিলেন। এই অবসরে জাভেরি ও দানতোষবাবু ছুটতে আরম্ভ করেছেন। নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম দেখা দেওয়ায় ইন্সপেক্টার গুলি চালালেন। দানতোষবাবু তখন পাঁচিলের ভাঙা খাঁজের কাছে পেঁছেছেন। ঐ অংশ অতিক্রম করে গেলেই তিনি অন্ধকারে মিলিয়ে যাবেন। আর হয়তো তাঁকে ধরা যাবে না। ওখানেই ঘায়েল করতে হবে তাঁকে।

রাই গুলি করলেন, অব্যর্থ লক্ষ্য। অবশ্য গুলি দানতোষবাবুর গায়ে লাগল না, জাভেরি প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। গুলি লাগার পর তীক্ষ্ণ চিৎকারে করে ঘুরে পড়ে গেল সে। সেই মুহূর্তে মৃত্যু এসে ওকে গ্রাস করল।

ডাঃ গুহ থামলেন।

ডাঃ সরকার প্রশ্ন করলেন, দানতোষবাবুর কি হল ?

—পরে তিনি ধরা পড়েছিলেন। চমকলাল আর রায়নাও এখন পুলিশের হাতে।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। মন ভারি হয়ে উঠল। আমার বুকের উপর কাটা-ছেঁড়া অবস্থায় যে সুন্দরী মেয়েটি দিন দুয়েক আগে পড়েছিল মন ভারি হয়ে উঠল তার জন্যই। অসংখ্য পুরুষকে বারবধূরা শুধু দেহদানই করে না ; প্রয়োজন উপস্থিত হলে ভালবাসার পাত্রের জন্য আত্মদানও করতে পারে—জাভেরি বাঈ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই রকম আরো কত দেখলাম। তোমাদের বলব একে একে সেই সমস্ত কাহিনী। হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলবে, শুনে কি লাভ ? আমার উত্তর হল, ক্ষতিও তো কিছু নেই। আমার মনকে হাল্কা করে দেবার সুযোগ কি তোমাদের দেওয়া উচিত নয় ?

একজন নগরনারী নিজের ভালবাসার পাত্রের জন্য কিভাবে প্রাণ দিল সে

কাহিনী আমি তোমাদের শুনিয়েছি। আমি লাশকাটা টেবিল। নিত্য কত কাহিনীর উৎসকে মৃতদেহের আকারে বয়ে এনে আমার বুকের ওপর শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা মানুষরা যে কত নিষ্ঠুর, তার পরিচয় পেয়ে প্রথম প্রথম হতবাক হয়ে যেতাম, এখন আর সে বোধ মনে প্রশ্রয় পায় না। এখন তোমাদের ওপর অনুকম্পা হয়। এই বিকার বোধই বিরাট মনুষ্যকুলের অন্তিম দিন ক্রমে ঘনিয়ে আনছে।

এ সমস্ত কথা তোমাদের ভাল লাগছে না জানি। সত্যি তো, আমার বা কি দরকার ঐ বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়বার? তোমরা উচ্ছন্নে যাও তাতে আমার কি? আমি বরং তোমাদেরই কাহিনী তোমাদের শুনিয়ে যাই। নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করার ইচ্ছে যদি এতে জাগে।

সেদিন ১১ই আগস্ট ১৯৪৪।

গতকাল আমার বুকের ওপর মড়া কাটা হয়নি। এরকম বিশ্রাম মাঝে মধ্যে আমি পাই। বেশ নিশ্চিন্ততার মধ্যেই গত কালটা কেটেছে। আজ কিন্তু তা হল না। বেলা বাড়ার মুখেই ডোমেরা একটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এল। তাকাবার পরই চমকে উঠলাম। বছর ত্রিশেকের মধ্যেই হবে মৃত যুবকের বয়স। তার গলার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ইঞ্চি দুয়েক ব্যাসের সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে! এমনভাবে নিহত হতে আমি আগে আর কাউকে দেখিনি।

যুবকটি রূপবান। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলেই মনে হয়। তার কাটা-ছেঁড়ার কাজ শেষ করলেন সার্জেনরা। আমি কিন্তু মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বলা বাহুল্য, কৌতূহলই শেষ পর্যন্ত অস্বস্তিতে রূপ নিয়েছে। যদি জানতে পারতাম এই যুবকের মর্মন্তুদ মৃত্যুর কারণ কি? মৃত্যুর নেপথ্যেই বা কোন্ কাহিনী আছে?

দুটো প্রশ্নেরই উত্তর পেলাম দিন পাঁচেক পরে।

আমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। চটকা ভাঙল ডাঃ ধরের কথায়। তিনি ডাঃ সরকারকে বলছিলেন, বিকাশ মিত্রের কেস্‌টার সম্পর্কে পুরো কাহিনীই আজ শুনলাম হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের পাল চৌধুরীর মুখে।

—কোন্ বিকাশ মিত্র?

—ঐ যে মশাই, যার গলা ফুটো করে খুন করা হয়েছিল।

—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। ও রকম বিশ্রী ভাবে আমি আগে কাউকে মরতে দেখিনি। ঐ খুনের নেপথ্য কাহিনী শোনার ইচ্ছে আমার ছিল। ভালই হল। বলুন তো ব্যাপারটা।

ডাঃ ধর তাই তো চান। সংগৃহীত কাহিনী নিজের মনের অ্যালবামে রেখে তিনি সন্তুষ্ট নন্। উপযুক্ত শ্রোতাকে শুনিয়েও আনন্দ পান। আরো একটি

বিশেষত্ব হল, কাহিনী বর্ণনাও করেন এমন সুন্দর ভঙ্গিতে যাতে মনে হয়, একটি ছাপা কাহিনী যেন ক্রমে ক্রমে চোখের ওপর ভেসে উঠছে। তিনি আরম্ভ করলেন—

বিকাশ মিত্র সম্বন্ধে কিছু বলার আগে, তার পিতামহ উমানাথ এবং মিত্র পরিবারের বিষয়ে কিছু বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সোনার চামচ মুখে নিয়েই উমানাথ জন্মেছিলেন এক অভিজাত পরিবারে। কিন্তু সেই সোনার চামচ জার্মান সিলভারে রূপ নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। কিছু বয়স বাড়ার পরই উমানাথ লক্ষ্য করলেন, তাঁদের বিরাট বাড়ির খিলানে ফাটল ধরেছে। সব ঘরের ঝাড় লণ্ঠনগুলো আর জ্বলে না। ঘরে ঘরে পাতা দামী জাজিমগুলোর ছোট ছোট খাঁচ বিরাট বিরাট হাঁ-এর আকার নিয়েছে। প্রথম যেদিন তিনি তাঁর বাবা দিবানাথকে বহু রাত্রে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতে দেখেন, সেইদিন থেকেই তিনি জানেন তাঁদের সমস্ত বৈভব আনুষঙ্গিকে আর মদের স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে।

বাড়ির শেষ ইঁটটিও বোধহয় বিক্রি হয়ে যেত যদি না দিবানাথ হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা যেতেন। মারা যাবার পর তিনি ছেলের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, আধভাঙা বিরাট বাড়িখানা আর পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত বেশ কিছু মূল্যবান পাথর।

এরপর উমানাথের জীবন-সংগ্রামের পালা। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কঠিন পরিশ্রমে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অবশেষে তিনি জয়লাভ করেছেন। জীর্ণ আবাস থেকে কিভাবে উঠে এসেছেন অভিজাত পাড়ার মূল্যবান গৃহে তার ইতিহাস বর্ণনা নিরর্থক। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে, তিনি তাঁর আগামী বংশধরদের জন্যে যা করেছেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

উমানাথের স্ত্রী বহুদিন গত হয়েছেন। বড়ছেলে রামনাথও মারা গেছেন বছর আটেক আগে। উপযুক্ত ছেলের বিয়োগই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শোক। অবশ্য আরো দুই ছেলে আছে—প্রিয়নাথ ও অমিয়নাথ। সুপ্রিয় প্রিয়নাথের একমাত্র ছেলে। অমিয়নাথের কোন সন্তান নেই। স্বর্গীয় রামনাথ রেখে গেছেন প্রকাশকে ও বিকাশকে।

বিকাশ যে ঐভাবে খুন হয়ে যাবে কেউ কল্পনাও করেনি। সে মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ ছিল। মিষ্টি স্বভাবের জন্যে তার সুনাম ছিল। তারও যে শত্রু আছে একথা কে ভেবেছিল! এবার সেই কথাতেই আসা যাক। সেদিন রবিবার। কাজের তাড়া নেই। বিকাশ নিজের ঘরে বসে অসীমের সঙ্গে গল্প করছিল। অসীম তার বন্ধু এবং উমানাথের একান্ত সচিব।

—কাল সন্ধ্যা বেলায় কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি ?

মৃদু হেসে অসীম বলল, তোমার দাদু বিনোদ জোহুরীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

—কেন ?

কেনর উত্তর আর দেওয়া গেল না। দোতলা থেকে কেমন একটা গোলমাল ভেসে গেল। দুজনেই সচকিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে গিয়ে পেঁছাল। উমানাথের দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিল প্রকাশ।

বিকাশ প্রশ্ন করল, কি হয়েছে দাদা ?

প্রকাশ এক টিপ নস্যি নিয়ে বলল, দাদু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

—সেকি !

বিকাশ ও অসীম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। উমানাথ খাটের ওপর শুয়ে আছেন। মুখে তাঁর শীর্ণ হাসি। ছোট পুত্রবধূ শ্রীলেখা দেবী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ডাঃ হাজরাও এলেন এই সময়। উমানাথকে নানাভাবে পরীক্ষা করার পর বললেন, ভয়ের কিছু নেই। সাময়িক দুর্বলতা। প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি। ওষুধটা আনিয়ে নিন।

প্রিয়নাথ ডাক্তারের পিছু পিছু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। উমানাথ এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ডাক্তার যাই বলুক, আমি তো বুঝি, আমার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

বিকাশ বলল, ওকথা কেন বলছো ? আমরা এখন তোমায় অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখব দাদু।

—নারে ভাই, দম ফুরিয়ে যাওয়া পুতুলের মত আমিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছি। প্রিয় কোথায় গেল—প্রিয়নাথ ?

প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, এই যে বাবা।

উমানাথ বললেন, আমি আর দেরি করতে চাই না। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা এখনই করে ফেলা দরকার। অসীমকে বিনোদ জোহুরীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে কাল আসবে। তিন পুরুষের সঞ্চয় করা হীরা, পান্নাগুলো বিক্রি করতে হবে ভাবতেও খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় কি ? উইল করার আগে বাড়িগুলো ছাড়া আর সমস্ত কিছুকে ক্যাশ টাকায় এনে ফেলতে চাই।

অমিয়নাথ বললেন, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ বাবা ! ও সমস্ত ধীরে-সুস্থে করলেই চলবে।

—না। ধীরে-সুস্থে কাজ করার সময় আর হাতে নেই আমার।

কেমন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিকাশ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা জানতে পারা গেল পরের দিন ভোরে। এরকমটা যে হবে স্বপ্নেও কেউ কোনদিন ভাবেনি। প্রবল চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল। আবার কি হল? উমানাথ কি হার্টফেল করলেন? সে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, সকলে দক্ষিণ দিকের সবশেষের ঘরখানার সামনে জড় হয়েছেন। ওখানে গিয়ে উপস্থিত হবার পর যে দৃশ্য চোখে পড়ল —উঃ!

ঘরের মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিকাশ। গলার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত গভীর ক্ষত। রক্ত কালো হয়ে গিয়ে চাপ বেঁধে রয়েছে। বলা বাহুল্য, মারা গেছে অনেক আগেই। সকলেই যেন কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু কি বলবেন স্থির করতে পারছেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন শ্রীলেখা দেবী। এই সময় উমানাথ ঘরে প্রবেশ করলেন। রোগজীর্ণ দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে এসেছেন তিনি। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিকাশের মৃতদেহের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, প্রিয়নাথ, পুলিশে খবর দাও।

পুলিশে খবর দেওয়া হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদলে স্থানীয় থানার ও, সি, অশোক সুর এসে উপস্থিত হলেন। এই প্রবীণ পুলিশ কর্মচারীটির কর্মকুশলতার খ্যাতি প্রচুর। প্রথমে তিনি খুঁটিয়ে মৃতদেহটি দেখলেন। গলার ক্ষত কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে সৃষ্টি হয়নি। মনে হয় কিছু দিয়ে পোড়াতে পোড়াতে এক ইঞ্চি ডায়মেটারের সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে গলায়।

এরপর ইন্সপেক্টার সুর সকলের জবানবন্দী নিতে আরম্ভ করলেন। কেউই বিকাশের রহস্যজনক মৃত্যুতে কোন আলোকপাত করতে পারলেন না। শুধু অমিয়নাথের কথাবার্তা তাঁকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করে তুলল।

—আপনি মৃত বিকাশ মুখার্জীর ছোটকাকা?

—হ্যাঁ।

—আপনার ভাইপোর মৃত্যু সংবাদ আপনি কিভাবে সংগ্রহ করলেন?

একটু ইতস্তত করে অমিয়নাথ বললেন, শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বারান্দায় এসে দেখলাম, বিকাশের ঘরের দরজাটা খোলা। কেমন সন্দেহ হল। এগিয়ে গিয়ে দেখি ও মেঝের ওপর মরে পড়ে আছে।

—আচ্ছা ঘুম ভেঙে যাবার পর আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাতেই বা এলেন কেন?

—মানে···কেন আবার—এমনি।

—আপনার উত্তর কিন্তু জোরাল হল না।

উত্তেজিত গলায় অমিয়নাথ বললেন, আপনি বলতে চান, আমিই আমার ভাইপোকে খুন করেছি?

—ও কথা সরাসরি না বললেও, কিছু সন্দেহ আমার মনে জাগছে। দেখুন তো এই বোতামটা চিনতে পারেন কি না?

ইন্সপেক্টার সাহেব একটা বড় বোতাম এগিয়ে ধরলেন।

—প্রশ্ন হচ্ছে, বোতামটা আপনার ওভারকোট থেকে ছিঁড়ে পড়েছে কি না। অমিয়নাথের গায়ের ওভারকোটের একটা বোতাম স্থানচ্যুত হয়েছে দেখা গেল। তিনি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

সুর আবার বললেন, বোতামটা আমি মৃতের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে পেয়েছি। নিশ্চয় স্বীকার করবেন বিষয়টি সন্দেহজনক। যাই হোক, আমাদের অনুমতি ছাড়া শহরের বাইরে এখন যাবেন না।

তখনকার মত তিনি বিদায় নিলেন।

থানার হাত থেকে কেসটি সঙ্গত কারণেই হোমিসাইড স্কোয়ার্ড টেকআপ করল। ঐ বিভাগের সুযোগ্য অফিসার রমেন পাল চৌধুরী ইন্সপেক্টার সুরকে সঙ্গে নিয়ে মিত্র হাউসে তদন্ত করতে এলেন।

ইতিমধ্যে তিনি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গলায় যে ক্ষত হয়েছে তাতেই মারা গেছে বিকাশ মিত্র। দু ইঞ্চি ডায়ামেটার লোহা বা ঐ জাতীয় কিছু পুড়িয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল গলায়। এ ছাড়া কাঁধে মাইনর ইঞ্জুরি আছে। মৃত্যুর সময় রাত এগারটা থেকে একটার মধ্যে।

বিকাশের ঘর পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না মিঃ পাল চৌধুরী। তিনি ইন্সপেক্টার সুরের মুখ থেকে সমস্ত কিছু শুনেছেন। এমন কি বোতাম ও অমিয়নাথের উপর সন্দেহের কথা। আরো একটা জিনিস পাওয়া গেছে—ইঞ্চি তিনেক লম্বা কাপড়ের টুকরো। দেখে মনে হয়, সবুজ পাড় বিশিষ্ট ধুতির ছেঁড়া অংশ। ঐ ঘরের দরজার পাল্লার সঙ্গে আটকে ছিল।

—অমিয়নাথবাবুর স্ত্রীকে ডেকে পাঠান।

শ্রীলেখা দেবী এলেন। তাঁর মুখ থমথম করছে।

মিঃ পাল চৌধুরী বললেন, নিশ্চয় জানেন পুলিশ আপনার স্বামীকে সন্দেহ করেছে?

তীব্র গলায় শ্রীলেখা দেবী বললেন, কেউ ওঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। উনি সেদিন মোটেই ওভারকোট পরেন নি। গরম পাঞ্জাবী পরেই উনি বেরিয়েছিলেন।

—ওঁকে এখন বাঁচাবার উপায় হচ্ছে, আমাকে পরিষ্কার করে সমস্ত কথা বলা। বলুন, কেন তিনি সেদিন শেষরাত্রে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন? আমার কাছে কোন কথা লুকোবেন না।

একটু চুপ করে থেকে শ্রীলেখা দেবী বললেন, ভয় পেয়ে উনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন। আসলে সেদিন রাত্রে তিনি বাড়িই ছিলেন না। ক্লাব থেকে শেষরাত্রে ফেরার পর বিকাশের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন।

—ক্লাবের নাম জানেন ?

—সাউথ এণ্ড ক্লাব।

—ধন্যবাদ। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

শ্রীলেখা দেবী নিষ্ক্রান্ত হবার পর অসীমকে ডাকা হল। দুর্ঘটনার দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাড়িতে কি কি ঘটেছিল প্রশ্ন করা হলে, সে বিনোদ জোহুরীর কাছে যাওয়া থেকে উমানাথের শরীর খারাপ, উইল করার কথা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বলে গেল।

—বিকাশবাবুর সঙ্গে কখন আপনার শেষ দেখা হয় ?

—রাত সাড়ে ন'টার সময়। সে বেশ উত্তেজিত ছিল।

—উত্তেজনার কারণ জানেন ?

—না। তবে তার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, সে এমন কিছু দেখেছিল যা নাকি বিশ্বাস করা যায় না। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, আজ একটু তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকবো। ডায়েরীতে অনেক কথা লিখতে হবে।

—উনি বুঝি নিয়মিত ডায়েরী লিখতেন ?

—হ্যাঁ।

অসীম চলে যাবার পর বিকাশের দাদা প্রকাশককে ডাকা হল। ভাই-এর মৃত্যুতে সে খুব ভেঙে পড়েছে। প্রকাশের কাছ থেকে কোন নতুন তথ্য জানতে পারা গেল না। সে কাকা অমিয়নাথকে হত্যাকারী হিসেবে মানতে রাজী নয়। তবে হত্যাকারী যে কে এ সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। প্রকাশ একজন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। তার রেডিও-র দোকানও আছে। এরপর প্রিয়নাথ ও অমিয়নাথের সঙ্গে কথা বললেন পাল চৌধুরী। প্রিয়নাথের ছেলে সুপ্রিয়র সঙ্গেও। সদ্য এম. এ. পাশ করেছে সে। তার কাঠখোট্টা কথাবার্তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যাই হোক, উমানাথের ঘরে একবার ঢুঁ মেরে মিঃ পাল চৌধুরী ওবাড়ি থেকে বিদায় নিলেন। যাবার আগে সুরকে বললেন, তিনটি বিষয় খোঁজ নিয়ে সন্ধ্যার পর আমার ওখানে যাবেন। এক উমানাথের ঘরে যে সিন্দুক আছে তার চাবি কোথায় থাকে। দুই উমানাথ নিজের ওভারকোট কোথায় রাখেন! তিন বিকাশের ডায়েরীটার খোঁজ করবেন।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

ইন্সপেক্টার সুর এলেন মিঃ পাল চৌধুরীর অফিসে। যে তিনটি বিষয়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছিল তা তিনি সমাধা করেছেন। সিন্দুকের চাবিটা থাকত উমানাথের বালিসের তলায়। আর অমিয়নাথের ঘরের সামনেকার বারান্দার দেওয়ালে ওভারকোটটা আটকানো থাকে। ডায়েরীটাও তিনি এনেছেন, ওটা পাওয়া গেছে বিকাশের শোবার ঘরের বুক-কেশ থেকে।

সমস্ত শুনে, ডায়েরীটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মিঃ পাল চৌধুরী

বললেন, বিরাট এক ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন অমিয়নাথ। আমি সাউথ এণ্ড ক্লাবে অনুসন্ধান করে দেখেছি, উনি সত্যি সেদিন রাত সাড়ে দশটা থেকে তিনটে অবধি সেখানে ফ্লাস খেলেছিলেন। সুতরাং পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুসারে এগারোটা থেকে একটার মধ্যে বিকাশকে তাঁর পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়। এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন, সন্দেহটা অন্য দিকে নিয়ে যাবার জন্য, বারান্দায় টাঙান অমিয়নাথের ওভারকোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে মৃত বিকাশের হাতে গুঁজে দিয়েছিল হত্যাকারী। আরো একটা কথা আছে, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, বিকাশকে তার ঘরে খুন করা হয়নি। অন্যত্র খুন করে তাকে বয়ে এনে রাখা হয়েছিল মাত্র।

—আপনার এই ধারণা হবার কারণ কি ?

—ধরুন আমি আপনাকে গরম কিছু দিয়ে গলায় ফুটো করে দেবার চেষ্টা করছি। আপনি নিশ্চয় আমাকে বাধা দেবেন। আমাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হবে। চারধারের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বিকাশের ঘরে সে রকম কোন নিদর্শন আপনি দেখতে পাননি। বরং সেখানকার যা যেরকমভাবে থাকা উচিত ঠিক সেই রকম আছে। এতে প্রমাণিত হয় না কি আমার অনুমানই ঠিক! অবশ্য এখনও দুটো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, খুনের মোটিভ কি ? আর, কি উপায়ে বিকাশকে খুন করা হয়েছে ?

সুর বললেন, মোটিভ সম্পর্কে এখনও আমি অন্ধকারে আছি। তবে বিকাশের কাঁধেব উপর যে ইঞ্জুরির কথা জানা গেছে, তা থেকে বলা যায় হত্যাকারী প্রথমে কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে বিকাশকে অজ্ঞান করে ফেলে, তারপর গলায় সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে।

—আপনার ধারণাই বোধহয় ঠিক। দেখি ডায়েরীটা নেড়েচেড়ে, ওতে যদি কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়।

পরের দিন সন্ধ্যায় মিঃ পাল চৌধুরী মিত্র হাউসে এলেন। সঙ্গে ইন্সপেক্টার সুর ও কয়েকজন কনস্টেবল। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি আসামীকে ডাকিয়ে কি সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন। হাতে তাঁর দুটো মোড়ক ছিল। মোড়ক দুটো নিয়ে তিনি উমানাথের ঘরে প্রবেশ করলেন। উমানাথ বিছানায় বসেছিলেন চিন্তাজর্জর মুখে।

সকলকে ডাকা হল এই ঘরে।

মিঃ পাল চৌধুরী বললেন, এই তদন্তের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা। সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি উমানাথবাবুকে অনুরোধ করছি, তিনি সিন্দুক খুলে দেখবেন দামী পাথরগুলো ঠিক মত আছে কিনা। উমানাথের নির্দেশে শ্রীলেখা দেবী সিন্দুক খুলে দামী পাথরের বাক্সটা বার

করে আনলেন। বাক্সটা খোলা হল। আশ্চর্য—সম্পূর্ণ খালি। হীরা, পান্না মুক্তার চিহ্নমাত্র নেই তাতে। সকলে এই অভাবনীয় ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মিঃ পাল চৌধুরীই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, ঐ হারানো পাথরগুলোই হল বিকাশবাবুর মৃত্যুর কারণ। আমি তাঁর ডায়েরী পড়ে জানতে পেরেছি, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কে ঐগুলো চুরি করেছে এবং··

তাঁকে বাঁধা দিয়ে ভাঙা গলায় প্রিয়নাথ বললেন, কে খুন করেছে বিকাশকে?

—সেই কথাই এবার বলব। সেদিন উমানাথবাবু যদি না বলতেন দামী পাথরগুলো অবিলম্বে ক্যাশে পরিণত করবেন তাহলে বিকাশবাবু হয়তো মারা যেতেন না। দামী পাথরগুলোর উপর লোভ বোধহয় হত্যাকারীর অনেক দিন থেকে। জহুরী আসবার আগেই তাই সে সেগুলো সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করল। এমন সময় সে বেছে নেয় যখন অসুস্থ উমানাথবাবুকে সেই পাহারা দেবে। তিনি তখন কড়া ঘুমের ওষুধে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। বালিসের তলা থেকে চাবি বার করে নিয়ে কাজ সারতে হত্যাকারীর কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু একজনের দৃষ্টি সে ফাঁকি দিতে পারল না। বিকাশবাবু দৈবাৎ দেখে ফেললেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। যে একাজ করল তার সম্বন্ধে এত নীচু ধারণা তাঁর ছিল না। এ সমস্ত বিষয় আমি তাঁর ডায়েরীতেই পেয়েছি। এর পরের ঘটনার জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে 'রুল অফ থাম্ব'র উপর। ডায়েরী লেখা শেষ করে বিকাশবাবু, দামী পাথর-চোরের ঘরে গেলেন বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য। চোর অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল—সাক্ষী যখন রয়েছে তখন ব্যাপারটা জানাজানি হতে বিলম্ব হবে না। কাজেই তাকে অবিলম্বে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হল। অসতর্ক মুহূর্তেই হোক বা ধস্তাধস্তি করেই হোক সে বিকাশবাবুকে আহত করল। তারপর আড়াআড়িভাবে গলার মাংস পুড়িয়ে তাঁকে খুন করা হল। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর ঘরে এবং সন্দেহের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য অমিয়নাথবাবুর ওভারকোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে বিকাশবাবুর হাতে গুঁজে দেওয়া হল।

একটানা বলার পর মিঃ পাল চৌধুরী থামতেই, অমিয়নাথ প্রশ্ন করলেন, কিন্তু হত্যাকারী কে তা তো বললেন না?

—হত্যাকারীর নাম তো আপনাদের আন্দাজ করে নেওয়া উচিত। যাক, প্রকাশবাবু আপনি কি বলেন?

বিস্মিত প্রকাশ বলল, আমি—আমি আবার কি বলব?

—আপনার মুখের ভঙ্গী কিন্তু খুব স্বাভাবিক হয়েছে। অভিনয় মনে হচ্ছে না।

—কি বলতে চাইছেন ?

—এই জিনিসটা চিনতে পারছেন ?

মিঃ পাল চৌধুরী খবরের কাগজের একটা মোড়ক খুলে বার করলেন ইস্পাতের ফলায় কাঠের মুঠাযুক্ত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার সঙ্গে কয়েক হাত তার ও প্লাগ যুক্ত রয়েছে।

—চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। আপনার ব্যবসার অর্থাৎ রেডিওর বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন হয় এই সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে।

প্রকাশ ভ্রূ কুঁচকে বলল, কি সমস্ত আজে বাজে বকছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তাই নাকি! নিতান্তই তাহলে বুঝিয়ে বলতে হয়। দামী পাথরগুলি চুরি করবার সময় বিকাশবাবু আপনাকে দেখে ফেলেছিলেন। সুতরাং আপনি এই একমাত্র সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি।

প্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল, কি প্রমাণ আছে আমার বিরুদ্ধে ?

—প্রমাণ না পেলে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহসী হতাম না। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, এই সোল্ডারিং আয়রনটা—এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস হলেই জানতে পারা যাবে বিকাশবাবুর রক্ত এর সঙ্গে হাল্কাভাবে মিশে রয়েছে। মৃতদেহ বয়ে আনবার সময় দরজায় আটকে আপনার সবুজ পাড়ের ধুতি খানিকটা ছিঁড়ে যায়, শুধু ছেঁড়া অংশটা নয়, আপনার সেই পুরো ধুতিটা এই যে—

পাল চৌধুরী দ্বিতীয় মোড়ক খুলে একটা ধুতি বার করলেন।

—ধুতি ও সোল্ডারিং আয়রনটা আপনার ঘর থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন অসীমবাবু। এছাড়া আপনার ঘর বা দোকান সার্চ করলেই দামী পাথরগুলো নিঃসন্দেহে পাওয়া যাবে।

ঘরের সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। এবার উমানাথ কাঁপা গলায় বললেন, প্রকাশ এ তুই কি করলি ভাই ?

—দাদু—।

মুখ ঢেকে বসে পড়ল প্রকাশ। কান্নার বেগে পুরো শরীরটা তার কাঁপতে লাগল। ইন্সপেক্টার সুর এগিয়ে গেলেন।···

এই তোমাদের মনের গঠন! সামান্য ক'টা পাথরের জন্যও তোমরা নিজের মায়ের পেটের ভাইকে খুন করতে কুণ্ঠিত হও না। আমি লাশকাটা টেবিল—দিনের পর দিন ধরে তোমাদের এই সমস্ত নির্দয় কার্যকলাপ দেখছি আর আমার

কঠিন কাঠের হৃদয় ভেতরে ভেতরে ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কোন বিকার নেই। তোমরা কোনদিন কি সুস্থমন নিয়ে জীবন কাটাবার কথা ভাববে না ?

অরণ্যে রোদন করছি। এত কথায় আমার দরকার কি? আমি শুধু গল্প বলব। তোমাদেরই গল্প নতুন করে শোনাব তোমাদের।

● ● ●

আজ বলি নতুন ধরনের একটি কাহিনী।

১৯৪৬ সালের তখন মাঝামাঝি। কয়েকদিন আগে একটি বীভৎস মৃতদেহ আমার উপর এনে শোয়ানো হয়েছিল। নামেই মৃতদেহ—নাক, মুখ, চোখ তার কিছুই ছিল না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংস যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে !

তবে এইটুকু বুঝতে পারা যাচ্ছিল, সে নারী নয়, পুরুষ। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মনে হল যেন শল্যবিদরাও প্রথমে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলেন। মানুষ এইভাবেও মরে ? এর আগে এত শোচনীয় অবস্থায় আর কোন মৃতদেহ আমার বুকের উপর আসেনি।

এই মৃত্যুর নেপথ্যকাহিনী শোনবার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। জানি, আমার চেয়ে অনেক বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ডাঃ গুহ। যে কোন উপায়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ তিনি করবেনই। প্রশ্ন হচ্ছে, কবে ? অবশ্য আমাকে দিন তিনেকের বেশী অপেক্ষা করতে হল না। ডাঃ গুহ নিজের সহকর্মীদের কাছে পুলিশ স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা তথ্য নিপুণ কাহিনীকারের মতই বর্ণনা করলেন। ও'রা কেউ জানেন না আমি শুনছি। ঠিক শোনা নয়—বলতে গেলে, আমি কাহিনীটি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল, শহর থেকে সামান্য কিছু দূরের একটা গ্রামে। স্টেশনের নাম পাটাম। কোন বড় গাড়িই এখানে দাঁড়ায় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপ ও ডাউন মিলিয়ে দুবার মাত্র এখানে স্টপেজ আছে গয়া প্যাসেঞ্জারের। তাও দু মিনিটের বেশি শ্রান্তি দূর করবার অবকাশ পায় না এখানে ইস্টার্ন রেলওয়ের সবচেয়ে ধীরগামী ট্রেনটি।

পাটামের কয়েক মাইলের মধ্যে বরিয়ারপুর। সেখানে ইলেক্‌ট্রিক আলো থেকে আরম্ভ করে অস্থায়ী সিনেমা হল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই আছে। পিচঢালা রাস্তার উপর দিয়ে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত যাওয়া যায়।

পাটামে সে সমস্ত সুবিধা নেই।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আঁচলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় গ্রামটি। কেরোসিনের আলো সে কালোর বুকে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। অবশ্য অজস্র জোনাকি এই সময় অন্ধকারকে তরল করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত

থাকে। এই রকম একটি সন্ধ্যায় কেউ পাটামে পা দিলে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, এই গ্রামের খুব কাছেই দুটি বিখ্যাত শহর আছে।

উদয় এই পাণ্ডববর্জিত গ্রামে এসেছে মাস দুয়েক হল। বলা বাহুল্য, বেড়াবার তাগিদে এখানে আসেনি। এসেছে কারখানার কাজেই। উদয় একটি বিখ্যাত কাগজের কারখানায় কাজ করে। কাগজ প্রস্তুতের জন্যে এক ধরনের বাঁশের প্রয়োজন হয়। এই অঞ্চলের পাহাড়ে সেই বাঁশের ঘন জঙ্গল আছে। এই সমস্ত জঙ্গল সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেয় কারখানাওয়ালারা।

উদয়ের কাজ হল, জঙ্গল থেকে যে বাঁশ সংগ্রহ হচ্ছে তা সুপারভাইজ করা এবং কলকাতার কাছে ওদের ফ্যাক্টরিতে পাঠানো। কলকাতা ছেড়ে পাটামে আসতে প্রথমে ও চায়নি। প্রোডাক্সন ম্যানেজার ওকে ভরসা দিলেন। বললেন, দূর থেকে জায়গাটাকে আফ্রিকা মুল্লুকের মত মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর এমুখো হতে চাইবে না।

ঠিকই বলেছিলেন তিনি। পাটামে পেঁছবার প্রথম দিনই এখানকার আকর্ষণের পরিচয় ও পেলো। ওর কপালের ভাঁজে ভাঁজে যে বিরক্তি সঞ্চিত হয়েছিল তা দূর হল। ট্রেন থেকে নেমে মোট-ঘাট নিয়ে যখন উদয় ওদের অস্থায়ী বাঁশ ও বেতের তৈরি ঘরে গিয়ে উঠল, তখন বেলা প্রায় দশটা।

খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আগে থেকেই এখানে ওর একজন সহকর্মী ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করল। চাকরের সাহায্যে চপচপে ঘি মাখানো খানকয়েক রুটি ও প্রায় এক জামবাটি মুর্গির মাংস এনে টেবিলের উপর রেখে বলল, এখন আর বিশেষ কিছু নেই, এই খেয়েই পেট ভরাও।

'বিশেষ কিছু নয়' বস্তুটিকে দেখে ওর চোখ ছানাবড়া।

এখানে মুর্গি পাওয়া যায় নাকি?

নির্বিকার গলায় অশোক উত্তর দিল, একটাকা জোড়া।

আমাদের জন্যেই দামটা একটু চড়ে গেছে, নইলে আরো সস্তা ছিল।

বল কি;

তাছাড়া মুর্গিতে যদি তোমার রুচি না হয়, হরিয়াল, সুরখাব ইত্যাদি সুস্বাদু কয়েকরকম পাখি পাবে। ইচ্ছে করলে মাটান খেতে পার। এই সমস্ত খাদ্য কলকাতায় রাজকীয় খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও, এখানকার সাধারণ মানুষ প্রত্যহ খায়।

এই সমস্ত উদরস্থ করেই বোধহয় তোমার শীর্ণ চেহারা এমন কুঁদো হয়ে উঠেছে।

ধরেছো ঠিক। তুমিও নিজেকে এই ফাঁকে মেরামত করে নিতে পারো। আমি তো ভেবে রেখেছি রিটায়ার করার পর এখানেই বাড়ি করব।

বলা বাহুল্য, পাটামের গভীর প্রেমে পড়ে গেল সেইদিন থেকে উদয়।

সন্ধ্যা তখন প্রায় ছটা।

শীতের সন্ধ্যা, চতুর্দিক ঘুটঘুট করছে। উদয় সার্জের সার্ট আর ফুলস্-সিপের উপর অলেস্টারটা চাপিয়ে নিল। গরম কাপড়ের এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনবে না এখানকার ঠাণ্ডা।

মাঝে মাঝে এই সময় বাসা থেকে বেরোয় উদয়; যায় দেবতোষবাবুর কাছে আড্ডা দিতে। দেবতোষ গাঙ্গুলি স্টোন চিপ্‌সের ব্যবসা করেন। এখানে পাহাড়ের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে চিপ্‌স্ পাঠাচ্ছেন আসাম-দিল্লী হাইওয়ের কাজে। বেশ দু পয়সা রোজগার করছেন এই কাজে।

সদালাপী, অমায়িক ভদ্রলোক। বিয়ে করেন নি। বড় ভাই মারা যাবার পর দুই ভাইপোকে ছেলের মত মানুষ করেছেন। তারাই এখন তাঁর প্রাণ। উমেশ আর রমেশ কাকাকে শ্রদ্ধাও করে খুব। চিপ্‌সের ব্যবসায় দুই ভাই হল দেবতোষবাবুর প্রধান সহায়। তিনজনে থাকেন এই পাটামেই। সপ্তাহে একবার করে বাড়ি যান।

উদয় আর অশোকের সঙ্গে দেবতোষবাবুর পরিচয় হয়ে যায় বেশ নাটকীয়-ভাবেই।

ও'র পাথর সমেত একটি ট্রাক কিভাবে যেন পাহাড়ের কাছেই অল্প-গভীর খাদে গিয়ে পড়েছিল। বহু চেষ্টা করে ট্রাক খাদ থেকে তুলতে না পেরে দেবতোষবাবু বাঁশ-কাটা কুলিদের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তাদের সাহায্যেই ট্রাকটিকে উপরে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই সূত্রেই উদয়দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট আলাপ হয়ে গেল। কুলিরা ওদের কোম্পানিরই ছিল।

আজ দুপুরেই উদয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দেবতোষবাবুর। তখন তিনি ট্রাকে পাথর বোঝাই করাচ্ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় চলেছেন।

কোথায় আর যাব, বাসায় ফিরছি।

বেশ আছেন। এরকম আরামের চাকরি পেলে আমি তো এখুনি ব্যবসা ছেড়ে দিতে রাজী।

দূর থেকেই মনে হয় আরামের চাকরি।

উদয়ের সঙ্গে অশোকও ছিল। বলল, খাটুনি যখন আরম্ভ হয়, তখন ঠেলার নাম বাবাজী বুঝতে পারা যায়।

দেবতোষবাবু পকেট থেকে পানের ডিবে বার করলেন। ডিবে থেকে গোটাতিনেক পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। এক চুটকি দোক্তাও চালান দিলেন। পান তিনি একটু বেশি মাত্রায় খান। মন্থরভাবে কয়েকবার চর্বন-সুখ উপভোগ করে তিনি বললেন, তা সময় সময় একটু কাজ-কর্ম করতে হবে বৈকি! আজ সন্ধ্যায় আসুন না উদয়বাবু আমার ওখানে। জমিয়ে

গল্প করা যাবে। তারপর অশোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো আবার সন্ধ্যা সাতটার সময় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন।

অশোক বলল, শীতকালে আমি সাতটার পর আর কোনমতেই জেগে থাকতে রাজী নই।

অগত্যা—

একাই উদয়কে যেতে হচ্ছে আড্ডা দিতে দেবতোষবাবুর ওখানে। অশোক অবশ্য এখনও শুয়ে পড়েনি। এইমাত্র ফিরেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিছানায় তলিয়ে যাবে।

টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল উদয়। ওদের বাসার শ'আটেক গজ দূরে দেবতোষবাবু থাকেন। কিন্তু তাঁর আস্তানায় গিয়ে তাঁকে পাওয়া গেল না।

প্রেমস্বরূপ গুপ্তা দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার গোড়ায়। তিনিই বললেন, গাঙ্গুলিবাবু এখনও ফেরেন নি।

চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

দুজনে ভেতরে গিয়ে বসল। দুজনেরই এখানে অবারিত দ্বার। প্রেমস্বরূপ হলেন স্থানীয় অধিবাসী। জমিজমা আছে। স্বচ্ছল অবস্থা। ঘটনাচক্রে আলাপ সকলের সঙ্গে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। চেহারা একটু নেয়াপাতি ধাঁচের।

উমেশ বাইরের ঘরেই ছিল। ওদের দুজনকে দেখে চাকরকে ডেকে চা আনতে আদেশ দিল।

উমেশের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। চালাক-চতুর ছেলে। ব্যবসার ভালমন্দর অনেকটা তারই ওপর নির্ভর করে। রণেশ উমেশের চেয়ে বছর চারেকের ছোট। একটু গোবেচারা ধরনের। অবসর সময় তাকে বন্দুক হাতে পাখির উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

চা এল। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলল তিনজনের মধ্যে।

ক্রমে সাড়ে সাতটা বাজল।

উদয় প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার বলুন তো উমেশবাবু, আজ দেবতোষবাবুর ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

চিন্তিত গলায় উমেশ বলল, আমি সেই কথাই তো ভাবছি। এত দেরি হবার তো কথা নয়। চোখে কম দেখেন বলে প্রত্যহ পাহাড়ের ধার থেকে পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসেন।

আজও ওই সময় ফিরবেন আমায় সকালে বলেছিলেন। প্রেমস্বরূপ বললেন।

আরো আধ ঘণ্টাটাক কাটল। আটটা বাজল।

এখনও দেখা নেই দেবতোষবাবুর।

তিনজনের মনে দুশ্চিন্তা চাপ বেঁধে বসল। শহর হলে অবশ্য চিন্তাকে-

প্রশ্রয় দেবার কোন অর্থ হত না। কিন্তু পাটামের মত গ্রাম বলেই কথা। তাছাড়া আরো কয়েকটা কারণ বিদ্যমান রয়েছে। দেবতোষবাবু চোখে রাত্রে অত্যন্ত কম দেখেন, পাঁচটার মধ্যে কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রত্যহ বাসায় ফিরে আসেন—এখানে সন্ধ্যার পর তাঁর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। তাছাড়া উদয় ও প্রেমস্বরূপকে ডেকে অনুপস্থিত থাকবেন তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই তাঁর সম্পর্কে চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষ করবে।

আরো কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর উমেশ রণেশকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাঁর সন্ধানে। উদয় এবং প্রেমস্বরূপ বিদায় নিল।

আসবার সময় উদয় বলল, দেবতোষবাবুর কোন সংবাদ পেলে আমাদের জানাবেন।

কিন্তু সমস্ত রাত খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর কোনও সন্ধান পেলো না উমেশরা। পাটাম স্টেশন থেকে সদরে টেলিফোনে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। ওখানেই দেবতোষবাবুর বাড়ি। যদি কোন খবর না দিয়েই বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকেন।

জানা গেল তিনি বাড়ি যাননি। কিন্তু গেলেন কোথায়?

ভোর হল। অশোককে সঙ্গে নিয়ে উদয় উপস্থিত হল দেবতোষবাবুর আস্তানায়। তিনি ফিরে এলেন কিনা সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া আবশ্যক বৈকি। প্রেমস্বরূপ আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল, দেবতোষবাবুর এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উমেশ ও রণেশ—দুই ভাই একরাত্রেই ভয়ে-ভাবনায় কেমন মিইয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে একজন বলল, পুলিশে খবর দিলে হয় না?

প্রেমস্বরূপ বললেন, এখনই পুলিশের হ্যাঙ্গামা করবেন না। আগে আমরা তাঁকে ভাল করে খুঁজে দেখি, একান্তই যদি সন্ধান পাওয়া না যায় তখন না হয়—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই অশোক বলল, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। দেবতোষবাবু নিজের কার্যক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন নি, কাজেই আমাদের অনুসন্ধান সেখান থেকেই আরম্ভ করা উচিত।

সকালে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়ের সেই অংশে গিয়ে উপস্থিত হল যেখান থেকে পাথর কেটে দেবতোষবাবু চালান দিতেন। চতুর্দিকে প্রচুর যন্ত্রপাতি ছড়ানো। একধারে সাতাশ-আঠাশ গজ জায়গা জুড়ে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো অসংখ্য পাথরের স্তূপ। এই সমস্ত মাপ করা পাথরের টুকরোই বক্স-ওয়াগন বা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠান হয়। মালগাড়ি আনার সুবিধার জন্য লাইন পাতা আছে।

কুলি, মেশিনম্যান ও ডিনামাইট চার্জের লোকেরা এখনও এসে উপস্থিত

হয়নি। তারা আসবে ন'টার পর। কাজ আরম্ভ হয় তখন। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সকাল থেকে কোন কাজে হাত দেওয়া এখানে অসম্ভব।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পূবের আকাশে সূর্যের আভা।

দেবতোষবাবু প্রতিদিন যে খড়ো ঘরে বসতেন, সে দরজা হাট করে খোলা।

রণেশ বিস্মিত গলায় বলল, বড়দা, দরজাটা তো এভাবে খোলা থাকবার কথা নয়!

উমেশও বিস্মিত হয়েছিল। সত্যি এই ঘরের দরজা তো এভাবে খোলা থাকবার কথা নয়। কারণ গাঁইতি ইত্যাদি লোহার কিছু সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বহু টুকিটাকি জিনিস থাকার দরুন প্রতিদিন বাসায় ফেরার আগে ঘরেব দরজায় তালা দিয়ে যেতেন দেবতোষবাবু। এই কাজে তাঁকে আজ পর্যন্ত অবহেলা করতে দেখা যায়নি। তবে আজ...

পাঁচজনে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ঘরের সমস্ত কিছুই যথাযথ রয়েছে বলে মনে হল উমেশ ও রণেশের। এমনকি তক্তপোশের ওপর ক্যাশবাক্সটি পর্যন্ত। যদিও ক্যাশবাক্সে এক নয়া পয়সাও থাকে না রাত্রে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সকলে অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কোথায় গেলেন দেবতোষবাবু! হঠাৎ উদয়ের দৃষ্টি পড়ল ঘরের হাত কয়েক দূরে দেবদারু গাছের তলাকার ঘাস-জমির ওপর। সবুজ ঘাসের ওপর লাল রংয়ের ছোপ পড়েছে। উদয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে আর সকলে এগিয়ে গেল।

রক্ত! প্রায় হাত দশেক রক্তের ছড়া দিয়ে কে এগিয়ে গেছে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কারু মুখে কথা নেই। একটা আশঙ্কা সকলের মনে গুলিয়ে উঠেছে। তবে কি—। শেষে প্রেমস্বরূপ নীরবতা ভঙ্গ করলেন:

—এখানে রক্ত পড়ে থাকার অর্থ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

—আপনি—আপনি কি বলতে চাইছেন? উমেশের গলায় আশঙ্কার প্রলেপ।

—দেবতোষবাবু আর বেঁচে নেই। ঘাস-জমিটা ভাল করে লক্ষ্য করুন। রক্তের সঙ্গে ভারি কিছু টেনে নিয়ে যাবার দাগও রয়েছে। এতে কি প্রমাণ হয় না, বাঘে তাঁকে নিয়ে গেছে।

অশোক বলল, আমারও তাই ধারণা। হাত দশেক টেনে নিয়ে যাবার পর তাঁকে মুখে করে জন্তুটা জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

উদয়ও সমর্থন করল দুজনের কথা। কারণ হপ্তাখানেক থেকে চিতার উপদ্রব অসম্ভব বেড়ে গেছে এখানে। এই হিংস্র চতুর জন্তুর অসম্ভব কোন কর্ম নেই। উমেশ ও রণেশ কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের কাকা ছাড়া যে

আর কেউ নেই। দেবতোষবাবুর জীবনে এইভাবে পূর্ণচ্ছেদ পড়বে একথা কে কল্পনা করেছিল!

কিছুক্ষণের মধ্যে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। পাটামের মত ছোট্ট জনপদেও চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল। উদয় ও অশোক নিজেদের কাজে গেল না। প্রেমস্বরূপও রইলেন। দুই ভাইকে দুপুরের দিকে কোনরকমে সামলান গেল।

উমেশ বলল, কাকার মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ার কি কোন সম্ভাবনা নেই?

উদয় বলল, আধ-খাওয়া দেহটা অবশ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে বিরাট জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পড়ে আছে তা কে বলবে!

—তাছাড়া—প্রেমস্বরূপ বললেন, সেই মাংসপিণ্ডকে উদ্ধার করতে যাওয়াই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় বোকামি। চিতার দল কোথায় ওৎ পেতে আছে কে জানে! হয়তো আমরাই কেউ তাদের কবলে পড়ে মারা যাব।

স্থানীয় একজন পুরুতকে ডেকে দেবতোষবাবুর শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিধান নেওয়া হল। যদিও এই সমস্ত কাজ বাড়িতে গিয়ে সম্পন্ন করান যেত, কিন্তু উমেশ ও রণেশের ইচ্ছে, এখানে যখন কাকার মৃত্যু হয়েছে, তখন শ্রাদ্ধাদি যা হবার এখানেই হোক।

পুরুত দেহাতি হলেও বেশ শাস্ত্রজ্ঞ। অপঘাতে মৃত্যু হলে যে সমস্ত বিধান শ্রাদ্ধের জন্যে দেওয়া উচিত তিনি তাই দিলেন।

কিন্তু বিকেলে সমস্ত ব্যাপারটাই ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রায় পাঁচটার সময় এক ভদ্রলোক দেখা দিলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি। ডান পা টেনে চলেন। আগে পুলিশে ভাল কাজ করতেন। পা জখম হয়ে যাবার পর কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন রোড কনট্রাক্টারি করেন।

নাম শ্রীবিষ্ণু সাহায়। তাঁকে প্রায়ই পাটামে আসতে হয়। দেবতোষবাবুর কাছ থেকে চিপস্ নিচ্ছিলেন মুঙ্গেরে—ভাগলপুরে সড়ক মেরামতের জন্যে। উদয়রা দেখেছে তাঁকে কয়েকবার। মৌখিক আলাপও আছে।

তিনি ঘরে ঢুকে উমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুবই দুঃখের কথা দেবতোষবাবু এইভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

উমেশ কিছু বলল না। রণেশ বলল, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হলে এত দুঃখের কারণ হত না।

—বটেই তো! আপনারা স্থির নিশ্চিত যে তাঁর মৃত্যু বাঘের হাতে হয়েছে বলে?

উদয় বলল, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

—আমি সদরেই সংবাদ পেলাম। শ্রীবিষ্ণু বললেন, ঘণ্টা দুয়েক হল এখানে এসেছি। পাহাড়তলীতে গিয়েছিলাম। দেখলাম ওঁর ওখানকার ঘর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কি ব্যাপার বলুন তো?

এই ধরনের খাপছাড়া কথায় সকলের মনে বিরক্তির সঞ্চার হল।

ভ্রূ কুঁচকে উমেশ বলল, আমরাও খোলা অবস্থাতে দেখেছি।

—ক্যাশব্যাক্সের মধ্যে হাজার আটেক টাকা পেয়েছিলেন ?

—আট হাজার টাকা ! ! !

—কই, না তো !

—টাকাটা কাল বিকেলে আমি তাঁকে বিলের দরুন দিয়েছিলাম। আমি যা সন্দেহ করেছি, দেখা যাচ্ছে তাই ঘটেছে। আপনারা সকলে শুনুন, দেবতোষবাবুকে বাঘে নিয়ে যায়নি ! তাঁকে খুন করা হয়েছে !

উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল সকলের শিরায় শিরায়।

রমেশ অস্ফুট গলায় বলল, কাকা খুন হয়েছেন।

—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনারা পুলিশে খবর দেবেন কিনা আমার জানা দরকার, নইলে পুরানো বন্ধুর হত্যা-তদন্তের জন্যে আমাকেই পুলিশে সংবাদ দিতে হবে।

অশোক বলল, আপনি যে কিভাবে দেবতোষবাবুর হত্যা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হচ্ছেন, আমি অন্তত বুঝতে পারছি না শ্রীবিষ্ণুবাবু।

নির্বিকার গলায় শ্রীবিষ্ণু সাহায় বললেন, আমার সিদ্ধান্ত আমি পুলিশকেই জানাব। তবে আপনাদের এইটুকু বলতে পারি, আমি একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারি। আপনাদের মত এই ধরনের ব্যাপারকে নির্বিকার মনে বিচার করি না, খুঁটিয়ে দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এখানেও সেই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতি বিচার করে তবে মতামত প্রকাশ করছি।

এই সম্পর্কে বাক্য-বিনিময় আরো কিছু হল।

এবং শেষে খবর দেওয়া হল পুলিশে। সদর থেকে সাব ইন্সপেক্টার লালচাঁদ এলেন তদন্তে। উমেশ ও রণেশের মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনলেন। তারপর শ্রীবিষ্ণু সাহায়কে নিয়ে পড়লেন।

এই ব্যক্তিটিকে খুব সুনজরে দেখেন না লালচাঁদ। কারণ মাসের মধ্যে প্রায় দশদিন টাউন থানায় গিয়ে শ্রীবিষ্ণু সাহায় অফিসারদের সঙ্গে আড্ডা মারেন। নিজের বুদ্ধির বড়াইয়ে পঞ্চমুখ হয়ে অনেক রাজা-উজির মারেন। লালচাঁদের মনোভাব হল, কোন্ মান্ধাতার আমলে তিনি পুলিশে চাকরি করতেন, তাই বলে এখনও হামবাগিজম্ সহ্য করতে হবে !

উদয়, অশোক বা প্রেমস্বরূপ তখন সেখানে নেই। লালচাঁদ উমেশ ও রণেশকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ওরা দুজন বেরিয়ে যাবার পর তিনি শ্রীবিষ্ণুকে প্রশ্ন করলেন, ঘটনাটা শুনে আমারও তো মনে হচ্ছে, অন্ধকারে গ্রামে ফেরার পথে দেবতোষবাবুকে চিতায় নিয়ে গেছে। অথচ আপনি বলছেন

তিনি খুন হয়েছেন। কোন সূত্রের ওপর নির্ভর করে আপনি এই কথা বলছেন জানাবেন কি ?

—নিশ্চয়ই। আপনাকে প্রথম থেকেই বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কনট্রাক্টারি করি। ওই সূত্রে দেবতোষবাবুর সঙ্গে আমার কারবার ছিল। গতকাল বেলা তিনটের সময় আমি তাঁর কাছে যাই। হাজার আটেক টাকা পাওনা ছিল, এই সময় সেই টাকাটা শোধ করে দিই। তিনি আমাকে রসিদ দেন। তারপর ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব হয়। তিনি কথায় কথায় বলেন, চোখে অত্যন্ত কম দেখছেন। আর মাসখানেকের মধ্যে কলকাতায় গিয়ে চোখ অপারেশন না করালেই নয়। আমি দুর্বল চোখ নিয়ে তাঁকে পাহাড়-তলীতে সন্ধ্যা অবধি থাকতে বারণ করলাম। তিনি বললেন, আজকাল বিকেল সাড়ে চারটের বেশি আর এখানে থাকেন না। দিনের আলোর মধ্যেই বাসায় ফিরে যান। আমি চারটের সময় ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। হাঁটা পথে, টানেল পার হয়ে চলে গেলাম। পরের দিন দুপুরের দিকে আমার দফাদার সোরাব মিয়া এই দুঃসংবাদ আমায় গিয়ে দিল। সে কার কাছে যেন শুনেছিল। আমি তখনই পাটাম রওনা হলাম। আমার কেমন ধারণা হল তাঁকে কখনই বাঘে নিয়ে যেতে পারে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি প্রথমে তাঁর ভাইপোদের কাছে না গিয়ে পাহাড়তলীতে গেলাম। সেখানে একটা পাথরের চাঁইয়ের সন্ধান আমি পেয়েছি। তাতে রক্তে মাখামাখি। রক্তের সঙ্গে কয়েক গাছা চুল শুকিয়ে রয়েছে। দেখলেই মনে হয় এই পাথর দিয়ে কারুর মাথায় আঘাত করা হয়েছিল ; আমি পরে শুনলাম আমার দেওয়া আট হাজার টাকাও অদৃশ্য হয়েছে। এরপর যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবে, চিতা বাঘ দেবতোষবাবুর মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে টাকা নিয়ে চম্পট দেবে না। কাজটা কোন মানুষেরই।

একটানা বলার পর থামলেন শ্রীবিষ্ণু সাহায়।

লালচাঁদ বললেন, আপনার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু মৃতদেহ গেল কোথায় ?

—হত্যাকারী কোথাও সরিয়ে ফেলেছে।

—চলুন, ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক। সেই রক্তমাখা পাথরটা একবার দেখা দরকার।

উদয় আর অশোকের মধ্যে দেবতোষবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল।

অশোক বলল, শ্রীবিষ্ণুবাবুর কথামত যদি তিনি খুনই হয়ে থাকেন, তবে কে তাঁকে খুন করতে পারে বলে তোমার ধারণা ?

উদয় বলল, ভাইপোদের ওপরই অবশ্য সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। তবে ওখানে

আরেকটা কথা আছে, ওরা দুজনই যখন ওঁর উত্তরাধিকারী, তখন অহেতুক ওঁকে খুনই বা করতে যাবে কেন ?

—তাও একটা কথা বটে। কিন্তু ওই রণেশকে আমার কেমন বিচিত্র মনে হয়। তুমি কিছুক্ষণ আগে স্টেশনে গিয়েছিলে, তখন সে এসেছিল আমার কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে।

—বল কি ! কি ধরনের প্রস্তাব ?

পাটামে কিছু জমি কিনেছিলেন দেবতোষবাবু। জমিগুলো নাকি ওরই নামে আছে। আমি যদি বাড়ি করার জন্যে কিনি, তাহলে ও বেচতে পারে। ব্যাপারখানা একবার বুঝে দেখ। কথাচ্ছলে সকলকে যেমন বলি, ওকেও একবার বলেছিলেন এখানে বাড়ি করার কথা, সেই কথার জের টেনেই আমার কাছে এসে উপস্থিত।

তুমি কি বললে ?

বললাম, সস্তায় যদি পাওয়া যায়, তবে আমার নিতে আপত্তি নেই। বলে গেল, টাকার ব্যবস্থা করুন, গোলমাল মিটলেই জমি রেজেস্ট্রি করে দেব।

দেবতোষবাবু মারা গেছেন এখনও দু'দিন হয়নি - তাঁর ভাইপোর এই মেণ্টালিটি মোটেই সমর্থনীয় নয়। চল, ওখানেই যাওয়া যাক। শুনলাম পুলিশ এসেছে তদন্তে।

দুজনে দেবতোষবাবুর বাড়ি গেল। লালচাঁদ শ্রীবিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়তলী থেকে ফিরে এসেছেন। প্রেমস্বরূপও উপস্থিত রয়েছেন। টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে চওড়া ধরনের একটা রক্তমাখা পাথর।

উমেশ ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লালচাঁদের। লালচাঁদ সকলকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন। বললেন, দেবতোষবাবু যে খুন হয়েছেন তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। হত্যাকারী তাঁকে ওই পাথরের আঘাতে খুন করে, তাঁর দেহ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, তারপর চম্পট দিয়েছে ক্যাশবাক্সের টাকা নিয়ে। এখন আমাদের সামনে দুটো প্রশ্ন রয়েছে—তাঁর বডি কোথায় এবং কে তাঁকে খুন করেছে। এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ এই কাজ করেছেন, না সম্পূর্ণ কোন অপরিচিত লোক যে শুধু ওই টাকার লোভেই তাঁকে খুন করেছে, তাও খতিয়ে দেখতে হবে। যাই হোক, অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ করছি, রণেশবাবু আমাদের চা খাওয়ান।

মিনিট দশেকের মধ্যে চায়ের ব্যবস্থা হল। চা-পান পর্ব শেষ হবার পর লালচাঁদ আবার বললেন, আজ আপনাদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা আর বলব না। এই ঘরে আমার একটু কাজ আছে। ভাল কথা, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ পাটামের বাইরে যাবেন না।

সকলে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

লালচাঁদ দরজা বন্ধ করলেন।

দিন তিনেক কেটে গেছে।

দেবতোষবাবুর হত্যার কোন সমাধান হয়নি। লালচাঁদের দেখা নেই। সেই যে তিনি গেছেন, আর পাটামে পা দেননি। অবশ্য সেইদিন দুপুরেই তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। তিনি সকলকে ডাকিয়ে পাঠালেন পাহাড়তলীর সেই খড়ো ঘরটার কাছে।

উদয় প্রশ্ন করল, কোন কিনারা হল?

লালচাঁদ নিজের মোমের মাজা দেওয়া গোঁফ মুচড়ে নিয়ে বললেন, হত্যাকারীর সন্ধান আমি পেয়েছি।

—বলেন কি!

—সুখের কথা এইটুকু যে এর জন্যে আমাকে ছুটোছুটি করতে বা বিশেষ বিশেষ মাথাও ঘামাতে হয়নি। হত্যাকারী অপরিচিতদের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাও নয়। সে এখন এখানেই উপস্থিত রয়েছে।

ইন্সপেক্টারের কথায় সকলের মনেই বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলল না।

লালচাঁদ বললেন, হত্যাকারীর কথা এখন থাক। দেবতোষবাবুর মৃতদেহের সন্ধান করাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। এ সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু বলতে পারেন কি? আমি লোক লাগিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশ্য এর মধ্যে জন্তুরা তাঁর দেহকে উদরস্থও করে থাকতে পারে।

শ্রীবিষ্ণু বললেন, জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেখানে দেবতোষবাবুর দেহ পাওয়া যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই, তিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা ব্যক্তি। এখান থেকে তাঁর দেহ গভীর জঙ্গলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত্যাকারীর পক্ষে কষ্টের ছিল। অল্প জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলে প্রথম দিনই আমাদের চোখে পড়তো। কাজেই আমাদের ভেবে নিতে হবে, হত্যাকারী মৃতদেহ খুব বেশি দূরে বয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। কাছাকাছি কোথাও আছে।

প্রেমস্বরূপ বললেন, কাছাকাছি থাকলে আমাদের চোখে পড়তো না?

—কেন আমাদের চোখে পড়ছে না সে সম্বন্ধেও আমি কিছু ভেবেছি। আপনাদের বুঝিয়ে বলছি শুনুন। এই খড়ের ঘরের কাছ থেকে বেশ কয়েক হাত রক্ত পড়ার দাগ আছে, তারপর আর নেই। এই দাগ দেখে আপনাদের ধারণা হয়েছিল, চিতা দেবতোষবাবুকে কিছুদূর টেনে নিয়ে যাবার পর মুখে করে সরে পড়েছে। হত্যাকারী আপনাদের মনে এই ধারণা গেঁথে দেবার

জন্যেই এই কাণ্ড করেছিল। আমার ধারণা রক্তের দাগ শেষ হয়েছে যেখানে মৃতদেহ তার কাছেই পাওয়া যাবে। আসুন রক্তের দাগের শেষ প্রান্তে আমরা গিয়ে দাঁড়াই।

ঘাসের ওপর শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া রক্তের দাগ তখনও ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীবিষ্ণু এগিয়ে গেলেন। আর সকলে অনুসরণ করলেন তাঁকে। রক্তের দাগের শেষপ্রান্তে এসে দেখা গেল তার একধারে অগভীর জঙ্গল, অন্যধারে স্টোন চিপ্‌স মাপ অনুসারে স্ট্যাগ করে করে রাখা রয়েছে। মৃতদেহের চিহ্নমাত্র নেই।

প্রেমস্বরূপ অবজ্ঞাভরে হাসলেন।

উদয়, অশোক, উমেশ, ও রণেশ শ্রীবিষ্ণুর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত বোধ করল।

শ্রীবিষ্ণু ইন্সপেক্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি মিন করছি ?

দ্রুত গলায় লালচাঁদ বললেন, আপনি বলতে চাইছেন ওই স্ট্যাগ করা স্টোন চিপ্‌স্‌গুলোর মধ্যে দেবতোষবাবুর মৃতদেহ আছে ?

—নিঃসন্দেহে।

—কিন্তু এতগুলো স্ট্যাগের মধ্যে কোন্‌টাতে মৃতদেহ আছে কিভাবে বুঝব ?

—প্রথম থেকেই আমাদের পর পর দেখে যেতে হবে।

কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গেই ছিল, লালচাঁদ তাদের পাথর সরাতে হুকুম দিলেন।

বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হল না, প্রথম স্ট্যাগের মধ্যেই দেবতোষবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গেল। পাথরকুচির তলায় চাপা থাকলেও ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে দেহটা।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শ্রীবিষ্ণুর দিকে তাকালেন লালচাঁদ। এই প্রথম বার অনুভব করলেন এই হামবাগ লোকটি শুধুই হামবাগ নন।

পচা মড়ার ওপরই প্রায় তখন আছড়ে পড়েছে উমেশ আর রণেশ। তাদের কোনরকমে তুলে আনা হল। বিস্তর বুঝিয়ে-শান্ত করা গেল।

খড়ের ঘরের মধ্যে সকলে গিয়ে বসলেন। মাথা থেঁতলান মৃতদেহ জীপে চাপিয়ে দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে সদরে পাঠান হল।

লালচাঁদ বললেন, শ্রীবিষ্ণুবাবু আমাকে যেভাবে সাহায্য করলেন তাতে তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। এবার আমি এই ঘটনার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাই। হত্যাকারী আমাদেরই মধ্যে এখানে উপস্থিত রয়েছে। সে একটু সতর্ক হলে আমি তাকে ধরতে পারতাম না। দেবতোষবাবু খুন হয়েছেন, তা

আপনাদের অজানা নয়। যে পাথর দিয়ে খুন করা হয়েছে, তাও সকলে দেখেছেন। পাথরের চাঁইটার ওপর হাতের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য পাথরের ওপর হত্যাকারীর হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে উদয় হওয়াতেই সেদিন আমি চায়ের জন্যে কাতর হয়ে পড়লাম। চা এল। সকলে চা পান করলাম। তারপর আপনাদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে আমি কাগজের কতকগুলো টুকরোয় আপনাদের প্রত্যেকের নাম লিখলাম। যে, যে পেয়ালায় চা খেয়েছেন, তাঁর নাম লেখা কাগজের টুকরো সেই পেয়ালার ভেতর দিকে গঁদ দিয়ে এঁটে পাঠিয়ে দিলাম ফিঙ্গার প্রিণ্ট এক্সপার্টদের কাছে। পাথরের চাঁইটা পাঠাতে অবশ্য ওই সঙ্গে ভুলিনি। একদিনের মধ্যেই তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন। একটি পেয়ালার হাতের ছাপের সঙ্গে পাথরের ওপরকার হাতের ছাপের হুবহু মিল হয়েছে। অর্থাৎ সেই পেয়ালায় যে চা খেয়েছিল দেবতোষবাবুর হত্যাকারী সে। আপনারাও পেয়ালাটি দেখুন।

ক্যানভাসে চেন দেওয়া ব্যাগ ইন্সপেক্টারের সঙ্গেই ছিল। তিনি তার মধ্যে থেকে পেয়ালা বার করলেন। এগিয়ে ধরলেন উদয়ের দিকে।

উদয় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তার মধ্যে কাগজ আঁটা নামটি পড়তেই স্তম্ভিত হল।

অসম্ভব! সে কিছু বলার আগেই লালচাঁদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলেন একদিকে। উদয় মুখ ফিরিয়ে দেখল, অশোক দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের স্ট্যাগগুলোর মধ্যে।

অশোক—অশোকই তাহলে এই পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে!

কিন্তু বহু পরিশ্রম করেও অশোককে ধরা গেল না। কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছে কে জানে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল ক্রমে। কয়েকজন কনস্টেবল সেখানে মোতায়েন রেখে লালচাঁদ সকলকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

উদয় আর নিজের মধ্যে নেই। ওর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান যেন রহিত হয়ে গেছে। অশোক সামান্য আট হাজার টাকার জন্যে খুন করল দেবতোষবাবুকে! ও কি এখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে এইভাবে টাকা সংগ্রহ করতে ব্রতী হয়েছিল? হয়তো তাই।

দুর্ভাবনার অতলান্ত সমুদ্রে ডুবন্ত উদয় যখন বাসায় গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

পরের দিন অশোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

ওর রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন দেহটা পড়েছিল পাহাড়েরই একাংশে। এক্ষেত্রে অবশ্য সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, কোন রক্তলোলুপ চিতা এই ঘটনার জন্যে দায়ী।

* * *

আজ তোমাদের আরেকটা গল্প শোনাই। বুঝতেই পারছ তোমাদের গল্পই তোমাদের শোনাব। এবারও একটি মেয়ে খুন হয়েছিল! কত মেয়েই তো খুন হয়ে বা আত্মহত্যা করে আমার বুকের ওপর এসে শোয়। সব মৃত্যুর পিছনেই তো শোনবার মত কাহিনী থাকে না। যেগুলির সঙ্গে কাহিনী জড়িয়ে থাকে সেগুলিই বলছি। এই মেয়েটির কাহিনী বেশ চমকপ্রদ।

সেদিন যথারীতি মৃতদেহ এনে আমার বুকের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। মেয়েটির বয়স ত্রিশের নিচেই। স্লিম নয়, দেহের গড়ন একটু মোটার দিকেই। তবে সুন্দরী। গায়ের রং লালচে সাদা। তার ঘাড়ে ছোরা মেরে খুন করা হয়েছে। ছোরা এখন নেই। পুলিশ বার করে নিয়েছে। গভীর ক্ষতের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়।

মেয়েটির নাকি পরিচয় পাওয়া যায়নি এই কথা শুধু কানে এল। তারপর দিন সাতেক পার হয়ে গেল, এই খুন সম্পর্কে কোন কথাই জানতে পারলাম না! ডাঃ গুহর মত লোকও কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি বুঝতে পারা গেল। আমার মনের মধ্যে আনচান করতে লাগল সমস্ত কথা জানবার জন্যে। জানতে পারলামও সেইদিন।

একটি আত্মহত্যা করা বডিকে কাটাকাটির পর ডাঃ গুহ বললেন, সেই মেয়েটির মৃত্যুর রহস্য জানা গেছে। হত্যাকারীও ধরা পড়েছে। কলকাতার যে ইন্সপেক্টার তদন্ত করলেন, তাঁর মুখেই শুনলাম।

ডাঃ দে বললেন, কোন্ মেয়েটির কথা বলছেন ?

—ঐ যে মশাই ; ঘাড়ে উন্ড নিয়ে দিন সাতেক আগে এসেছিল। যার পরিচয় জানা যাচ্ছিল না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। হত্যাকারী ধরা পড়েছে তাহলে! ঘটনা নিশ্চয় ইন্টারেস্টিং হবে। বলুন তো শুনি ?

শল্যবিদ্‌রা কেউ জানে না, আমি লাশকাটা টেবিল ঐ কাহিনী শোনবার জন্যে কত উদ্‌গ্রীব। যা শুনলাম, তাই তোমাদের বলছি—

সোনচক এখান থেকে কিছু দূরে। ভোরবেলা ওখানকার স্টেশনে হৈ হৈ পড়ে গেল। হৈ হৈ পড়বারই কথা। দূরপাল্লার একটা গুডস্ ট্রেনের কুড়িখানা ছাড়া আর সব ওয়াগনেই মাল ভর্তি ছিল। ঐ কুড়িখানার একখানায় এখানে স্টোনচিপ্‌স্ ভরতে গিয়ে কুলিদের নজরে পড়ল ঐ সুন্দরী মেয়েটির মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে রেলপুলিশকে খবর দেওয়া হল। পুলিশ এসে মূল অংশ থেকে ওয়াগটিকে আলাদা করে সাইডিংএ নিয়ে গিয়ে রাখল। ইন্সপেক্টার

খ‍ু‍ঁটিয়ে মৃতদেহ দেখলেন। বিস্ময়ের বিষয় বইকি! যাত্রীবাহী ট্রেনের কোন কামরায় মৃতদেহ পাওয়া গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। কিন্তু গুডস্ ওয়াগনে লাশ পাওয়া অভূতপূর্ব ঘটনা। ড্রাইভারকে জেরা করে জানা গেল, কৌসাসন্ধি থেকে সে খালি ওয়াগনগুলি নিয়ে রওনা হয়েছিল। মাঝে রসুলপুর ও দিওয়ানগঞ্জ থেকে মাল তুলে নিয়ে এখানে এসেছে। মৃতদেহ কিভাবে ওয়াগনের মধ্যে এল, সে কিছুই জানে না। গার্ড ও ফায়ারম্যান ড্রাইভারকে ডিটো দিয়ে গেল। তবে ব্যতিক্রমের মধ্যে গার্ডকে তখন একটু অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টার প্রেমকিশোর জোর তদন্ত চালালেন। মৃতার ছবি তুলে নিয়ে থানায় থানায় পাঠান হল। রসুলপুর ও দিওয়ানগঞ্জের পুলিশ অনুসন্ধান করে হয়রান হয়ে গেল, কিন্তু ভিক্টিমের কোন পরিচয় সংগ্রহ করতে পারল না। তখন বাধ্য হয়েই ভারতের বিভিন্ন দৈনিকপত্রে মৃতার ছবি ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন প্রেমকিশোর।

এতে কাজ হল। সঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও বিরাট এক সূত্র পাওয়া গেল। কলকাতার বিখ্যাত জুয়েলার দুলাল সরকার একটি দৈনিকপত্র হাতে নিয়ে কথা বলছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের সুযোগ্য অফিসার শ্রীকান্ত ব্যানার্জীর সঙ্গে। তিনি তখন বলছিলেন, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মিঃ ব্যানার্জী, কাগজে যে মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে, চোরদের মধ্যে সে একজন।

শ্রীকান্ত বলল, ঘটনাটা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন তো!

মিঃ সরকার যা বললেন, তার মর্ম হল, দিন আটেক আগেকার কথা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল কলকাতা। ক্রেতা একেবারেই ছিল না দোকানে। এই দুর্যোগ মাথায় করে কে আসবে! বৃষ্টির ওপর বিরক্ত হয়ে দুলাল সরকার নিজের অফিস ঘরে পায়চারি করছিলেন। বেলা তিনটের সময় ক্রেতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বহুমূল্য পোশাকে সজ্জিত দুটি নারী-পুরুষ দামী গাড়ি থেকে নেমে এলেন। নিঃসন্দেহে মোটা খদ্দের। হৃষ্টচিত্তে দুলাল সরকার অফিস ঘর থেকে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ক্রেতা দুজন হীরের নেকলেশের প্যাটার্ণ পছন্দ করতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, উত্তর প্রদেশের এক খানদানি ঘর থেকে আসছেন ওঁরা। বোনের বিয়ে। কলকাতায় এসেছেন বাজার করতে। নানা ডিজাইনের প‍ঁয়ত্রিশ ছড়া নেকলেশ বার করা হল। মহিলাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। আচম্বিতে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটল। ভদ্রলোক পকেট থেকে রিভলবার বার করে গম্ভীর অথচ চাপা গলায় বললেন, চেঁচাবার বা নড়বার চেষ্টা করবেন না কেউ।

বড় সাইজের ভ্যানিটি ব্যাগে দ্রুতহাতে নেকলেশগুলি ভরে ফেলল তরুণী। তিনজন কাউন্টারম্যান ও দুলাল সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে

রইলেন। চারজনের যখন সম্বিৎ ফিরল, তখন দুজন ফেরার। গেটের দরোয়ান দুজনও কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর হৈ-হল্লা, হাঁকডাক, হা-হুতাশ—পুলিশ এল। ষাট হাজার টাকার হীরার গয়না নিয়ে তারা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আজ খবরের কাগজে ছবিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সরকার চিনতে পারেন—এই মেয়েটিই এসেছিল সেই পুরুষের সঙ্গে। তিনি লালবাজারে খবর পাঠাতে বিলম্ব করলেন না। সমস্ত শুনে শ্রীকান্ত বলল, ঠিক আছে। দেখি কি করতে পারি।

শ্রীকান্ত সোনচকে পৌঁছেই থানায় গিয়ে প্রেমকিশোরের সঙ্গে দেখা করল। নিজের পরিচয়পত্র দিয়ে, আগমনের উদ্দেশ্যে বলল। প্রেমকিশোর তাকে সমস্ত ঘটনা বলে, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখালেন। শ্রীকান্ত একটু চিন্তা করে ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও গার্ডকে ডাকিয়ে আনবার অনুরোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল। ওরা এল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ড্রাইভারকে আলাদা সরিয়ে এনে শ্রীকান্ত বলল, আপনি আগে যা বলেছেন তা আমি পড়েছি। সে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা আমি আর করতে চাই না। আপনি বলুন তো, রসুলপুর ও দিওয়ানগঞ্জ ছাড়া সিগনাল না পেয়ে গাড়ি আর কোথাও দাঁড়িয়েছিল কিনা ?

ড্রাইভার ফ্রেড হ্যারিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, সিগনাল কোথাও বাধার সৃষ্টি করেনি। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন দিওয়ানগঞ্জের আধমাইলটাক পরে একবার গাড়ি থামাতে হয়েছিল।

ফ্রেড ওখানে গাড়ি থামাবার বিশদ কারণ বুঝিয়ে দিল। প্রশস্ত একটা টানেল আছে ওখানে। আগে প্রবল বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে জল গড়িয়ে ট্যানল ভর্তি করে দিত। ট্রেন যাওয়া-আসার অসুবিধা হত। ইদানিং দুপাশে নালা কেটে দেওয়া হয়েছে জল বেরিয়ে যাবার জন্যে। সেদিন রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। টানেলের কাছাকাছি পৌঁছে তাকে ভ্যাকাম নিতে হয়। কারণ টানেল তখন জলে ভরে গেছে। দুপাশের নালা বন্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পারা গেল। ফায়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ফ্রেড নালা কেটে দিতেই জল বেরিয়ে যাবার পর আবার তারা যাত্রা করে।

—সে সময় গার্ড নিশ্চয় আপনাদের কাছেই ছিল ?

—না। তিনি আসেন নি।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে শ্রীকান্ত গার্ড বিনয় ঘোষকে ডেকে প্রশ্ন করল, দিওয়ানগঞ্জের কাছে টানেলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আপনি কারণ অনুসন্ধানের জন্যে তৎপর হন নি কেন ?

বিনয় ঘোষ থতমত খেয়ে বললেন, আমি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। নিজের কামরা থেকে নামবার সামর্থ ছিল না।

অসুস্থ শরীর নিয়ে ডিউটিতে আসা কি উচিত হয়েছিল ?

—অসুস্থ ছিলাম না। দিওয়ানগঞ্জে চা খাবার পর থেকে গা গুলোতে থাকে।

ফায়ারম্যানকে আর কোন প্রশ্ন করা অনর্থক বিবেচনা করে তিনজনকে যেতে বলল শ্রীকান্ত। তারপর প্রেমকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দৃঢ় ধারণা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে টানেলের দুপাশের নালার মুখ বন্ধ করা হয়েছিল। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই অন্ধকারের মধ্যে খালি ওয়াগনে মৃতদেহ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান কেন্দ্র সোনচক নয়, দিওয়ানগঞ্জ। মৃতা তরুণী ওখানকার বাসিন্দা ছিল এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সেইদিনই দুজনে ট্রেনে রওনা হল। টানেল অতিক্রম করার সময় শ্রীকান্ত লক্ষ্য করল, পাহাড়ের সেই অংশে বহু কুলি পাথর কাটছে। পরে চিপস্ তৈরি করে, নানা জায়গায় চালান দেওয়া হয়। দিওয়ানগঞ্জে নেমে লাইন ধরে দুজনে টানেলের কাছে এল। পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেল, মাটি ও পাথর দিয়ে নালার মুখ বন্ধ করা হয়েছিল। চারদিক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে একটা চকচকে কিছুর ওপর দৃষ্টি আটকাল শ্রীকান্তর। এগিয়ে গিয়ে রুমালের সাহায্যে জিনিসটা তুলে নিল—লাইটার।

ফেরার পথে শ্রীকান্ত বলল, এই শহরে কত লোক বাস করে ?

প্রেমকিশোর বললেন, লাখখানেক হবে।

—লাখখানেক লোকের মধ্যে থেকে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা সহজ নয়। আমি পরিধিকে বেশ ছোট করে আনতে চাই। টানেলে যাতে বৃষ্টির জল না জমে তার জন্যে নালা কাটা হয়েছে একথা সকলের জানা সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ মানুষ ট্রেনে চড়েই টানেল অতিক্রম করতে অভ্যস্ত। পায়ে হেঁটে ওখানে যাবার প্রয়োজনীয়তা ক'জনের আছে বলুন ? ঐ বিশেষ বিষয়টি জানা সম্ভব যারা পাথর কাটছে তাদের আর কোয়ারী কোম্পানীর মালিকদের।

—আপনার অনুমান ঠিক পথেই চলছে।

—হত্যার ব্যাপারে কিন্তু কুলিদের বাদ দিতে হবে। অবশ্য ওদের মধ্যে কাউকে টাকা দিয়ে নালার মুখ বন্ধ করান হয়ে থাকতে পারে। মৃতা তরুণীর সাজপোশাক ও কলকাতায় তার কাণ্ডকারখানার কথা ভেবে নিয়ে সহজেই বলা চলে সে কুলিদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করত না। এখন বাকি রইলেন কোয়ারীর মালিকবর্গ। আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এখানে ক'টি কোম্পানি পাথর কাটছে এবং তাদের মালিক কে কে ?

বিশেষ অসুবিধা হল না। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অতি সহজেই সমস্ত

ইনফরমেশন পাওয়া গেল। মোট কোম্পানীর সংখ্যা চারটি। তাদের মালিক হলেন যথাক্রমে, রাজবীর শরণ, ছগনলাল জৈন, মধুকর বর্নবাল ও ও রামদ্বীপ লুম্বা। আরও খবর পাওয়া গেল মৃতার পরিচয়। ছবির কপি নিয়ে দিওয়ানগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়েছিল। সন্ধান পাওয়া গেল বারবধূ পল্লীতে। একজন দালালের বিবৃতি অনুসারে জানা গেল, এই মেয়েটির এখানে ঘর নেওয়া আছে। নিয়মিত সে এখানে থাকে না। যে ক'দিন এখানে এসে থাকে অনেক রহিসের আগমন হয় তার ঘরে। আর্থিক অবস্থা আপাতত ভাল। নাম মানকুমারী।

কোয়ারী কোম্পানীর মালিক চারজনকে আহ্বান করা হল থানায়। দুলাল সরকার নেকলেশ চোরের বর্ণনা দিয়েছিলেন। মেদবহুল শরীর, চোখে চশমা, পুরুষ্ট গোঁফ, কালো ব্যাকব্রাস করা চুল, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। শ্রীকান্ত লক্ষ্য করল, দুটি বিষয় সকলের ওপরই প্রযোজ্য। মেদবহুল শরীর ও বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। মধুকর বর্নবালের শুধু চশমা আছে। তাঁর সঙ্গে প্রথমে কথা আরম্ভ করল শ্রীকান্ত। অন্যান্যরা বাইরের ঘরে রইলেন।

—নিশ্চয় শুনেছেন কেন আপনাদের ডাকা হয়েছে ?

বর্নবাল বিরক্তির সুরে বললেন, আপনাদের কাণ্ডকারখানায় অবাক হয়ে গেছি। কোথাকার কে খুন হল, আমি কি জানি ?

— মানকুমারী নামে কাউকে চেনেন ?

—মোটেই না। আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি মশাই। অন্য মেয়ে তো দূরের কথা নিজের স্ত্রীর সংবাদ রাখাই আমার কাছে কষ্টকর।

১০ই নভেম্বর (ঐ তারিখে মানকুমারী খুন হয়) আপনি কোথায় ছিলেন ?

—কোথায় আবার। এখানেই- -

—ঐদিন টানেলের কাছে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন ?

—আমি ওয়ার্কসাইটে যাই না। তাছাড়া বৃষ্টির দরুন আট তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত কাজ বন্ধ ছিল।

—শুধু আপনার, না আর সকলের ?

—অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার মশাই। বৃষ্টির জন্যে আমার একা কেন সকলের কাজই তো বন্ধ হবে। আর আপনার কোন প্রশ্ন নেই নিশ্চয় ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বর্নবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর রাজবীর শরণ। শ্রীকান্তকে কিছু বলতে না দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, মালগাড়ির মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে তার জন্যে আমাদের টানাটানি করছেন কেন ?

—টানাটানি ঠিক নয়, জিজ্ঞাসাবাদ বলতে পারেন। আপনি মানকুমারী নামে কোন মেয়েকে চেনেন ?

—চিনি বইকি। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আমাদের বর্নবাল সাহেবের তার কোঠিতে যাতায়াত আছে। মানকুমারীর খোঁজ করছেন কেন বলুন তো ?

—মানকুমারী খুন হয়েছে।

—অ্যাঁ- বলেন কি ?

—মানকুমারীর সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ হয় ?

—ইয়ে…মানে…আমার একটু জায়গা বিশেষে যাবার অভ্যাস আছে। একদিন ওর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম আর কি, তারপর থেকে।… আপনি আমাকে মানকুমারীর হত্যাকারী বলে মনে করছেন না তো ?

—আপনি হত্যাকারী না হলে আমার কথায় কি এসে যায় বলুন ? আচ্ছা, এবার আসুন-। এবার এলেন রামদীপ লুল্লো। মাথায় চকচকে টাক। চোখের ঔজ্জ্বল্য দেখে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। মানকুমারীকে চেনেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে লুল্লো বললেন, চিনি। তার কোঠিতে মাঝে মাঝে গেছি।

—ওয়াগনের মধ্যে মানকুমারীর লাশ পাওয়া গেছে।

—সেকি! খুন হয়েছে ? অবশ্য আমার ধারণা ছিল তার জীবনের পরিণতি এ রকম হতে পারে।

—এ রকম ধারণা হবার কারণ ?

—বাজারের অন্য মেয়ের মত সে ছিল না। মাঝে মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত। গাঁজা স্মাগলারদের সঙ্গে নাকি তার সম্পর্ক ছিল। স্বার্থ নিয়ে বিবাদ বেঁধেছে - দিয়েছে কেউ শেষ করে। আর গোটা কয়েক প্রশ্ন করার পর লুল্লাকে বিদায় দিল শ্রীকান্ত। বাকি থাকলেন ছগনলাল জৈন। তিনি লুল্লো ও রাজবীরের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করে গেলেন। শুধু নতুন কথার সঙ্গে জানা গেল, এঁরা চারজন ছাড়া আর একজন মানকুমারীর কাছে যাতায়াত করত। তার নাম দীনদয়াল চাতুরী। সে একজন স্যাকরা। চোরাই গয়না সে নাকি কেনাবেচা করে থাকে।

—অনেক দরকারী কথা জানা গেল। শুনুন, এখন আপনাকে তিনটি কাজ করতে হবে। আজই ক্যালকাটা পুলিশের কাছে লোক পাঠাতে হবে। আমি চিঠি দিয়ে দেব। সে কাজ সেরে যেন কালই রওয়া হয়। দ্বিতীয়, মানকুমারীর ঘর সার্চ করতে হবে। তৃতীয়, আমি গোটা কয়েক জায়গায় এনকোয়ারিতে যাব। স্থানীয় কোন সাব-ইন্সপেক্টার যেন আমাকে সহযোগিতা করেন।

সেই দিনই মানকুমারীর ঘর সার্চ করা হল। বহু মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত ঘরের দিকে তাকালে বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে যে, এই ঘর একজন দেহবিলাসিনীর। স্পিরিট-গামের শিশি ছাড়া কাজে লাগাতে পারে এমন আর কিছু পাওয়া গেল না সেখানে।

দুদিন কেটে গেছে।

এই দুদিন শ্রীকান্ত বিশেষ ব্যস্ত ছিল। শহরের ছোট-বড় দোকানে সে কি অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে। সাবধান হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে স্যাকরা দীনদয়ালের কাছে যায়নি। সরঞ্জাম কলকাতা থেকে সঙ্গে করে এনেছিল। কতগুলি ফিঙ্গার প্রিন্ট তুলেছে। তারপর প্রেমকিশোরের সঙ্গে পরামর্শ করে পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছে ফাঁদপাতার।

আবার চারজনকে থানায় ডাকা হল। তাঁরা আসতে চাননি। বার বার হয়রান করবার অধিকার অধিকার পুলিশের আছে কিনা এই প্রশ্ন তুলেছেন। আইনের সাহায্য নিতে পারেন এ হুমকিও দিয়েছেন কেউ কেউ। তবুও কিন্তু চারজনকে আসতে হল থানায়।

শ্রীকান্ত বলল, আপনাদের মনের ভাব আমি জানি। অনন্যোপায় হয়ে আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। বুঝতে নিশ্চয় পেরেছেন মানকুমারীর খুন হওয়ার ব্যাপারে, আমি আপনাদের সন্দেহ করেছি। চারজন মিলে তাকে খুন করেছেন একথা বলতে চাই না, তবে চারজনের মধ্যে একজন যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নাই।

চারজনই একটু উসখুস করলেন।

—মুখের কথাতে আমরা জানতে পেরেছি। হত্যার মোটিভও অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি। মানকুমারী বারবনিতা। হত্যাকারীর তার কাছে যাতায়াত ছিল। দুজনের মাথায় বিচিত্র এক পরিকল্পনা উদয় হয়। কলকাতায় গেল দুজনে। অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে সরকার জুয়েলারী থেকে ষাট হাজার টাকার হীরার গয়না হাতিয়ে সরে পড়ল। তারপর নিজেদের মধ্যে বনিবনা হল না বোধহয়। হত্যাকারী নিশ্চয় চিন্তা করে দেখল কু-কাজের সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। মানকুমারীকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। পুলিশকে মিসলিড করার জন্যে মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করে দেবার ব্যবস্থা হত্যাকারী করল। বৃষ্টির দরুন পাথর কাটার কাজ কয়েকদিন বন্ধ ছিল। টানেলের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি কারুর। কাজেই নালা বন্ধ করার ব্যাপারে হত্যাকারীকে কোন অসুবিধা বোধ করতে হয়নি। তার ট্রাক আছে। তাতে মৃতদেহ চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যায় সেখানে। অপেক্ষা করতে থাকে গুডস্ ট্রেনের। ট্রেন আসে, স্বাভাবিকভাবেই থেমে যায়। একটি খোলা ওয়াগনে মৃতদেহ রেখে দেওয়া হয়। অবশ্য একটা কাজ হত্যা-কারীকে আগেই সেরে রাখতে হয়েছে। কৌশলে নেশাযুক্ত চা খাওয়ান হয় গার্ডকে। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নালা কাটবে—তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গার্ড আলো নিয়ে এধার ওধার ঘোরাঘুরি করলে চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই এই সতর্কতা। হত্যাকারী অবশ্য আরো একটি কাজ করেছিল।

মানসকুমারীর সঙ্গে একজন ধূর্ত স্যাকরার পরিচয় ছিল। তার সাহায্যে সমস্ত হীরার গয়না বিক্রি করা হয় মানকুমারীরই একজন বাঁধা খদ্দেরের কাছে। যাঁকে একজন চোরাই মালের আড়তদার বলা চলে।

একনাগাড়ে এতখানি বলার পরে শ্রীকান্ত থামল। সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলল, বর্নবালজী, গয়নাগুলো সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

বর্নবাল বললেন, আমি···আমি আর কি বলব ? আপনি আমার সম্মানকে আঘাত করবার চেষ্টা করছেন।

—স্থির নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলিনি। চোরাই মাল কিনে চড়া দরে বিক্রি করার ব্যবসা আপনার অনেক দিনের না, আপত্তি করবার চেষ্টা করবেন না। পুলিশ অলরেডি আপনার বাড়ি রেড করেছে। এতক্ষণে বোধহয়, পুলিশ চাপ দিয়ে স্যাকরা দীনদয়ালের কাছ থেকে সমস্ত কথা বার করেছে।

বর্নবাল কিছু বলতে পারলেন না। বাকি তিনজনও চুপচাপ।

—হত্যাকারী অত্যন্ত ধূর্ত। আপনার চেহারার সঙ্গে মেকআপের সাহায্যে নিজের সৌসাদৃশ্য এনে সে কলকাতায় ডাকাতি করেছিল। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, সর্বক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। মিঃ লুল্লা এখন বোধহয় তা হৃদয়ঙ্গম করছেন ?

—আমি ! লুল্লা আকাশ থেকে পড়লেন। —আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন ?

শ্রীকান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, টানাটানি না করে তো উপায় নেই। আপনি চমৎকার পরিকল্পনা করে মানকুমারীকে হত্যা করেছেন। শুধু তাই নয় নিজের টাকের ওপর নকল ব্যাকব্রাস তুলে, গোঁফ এঁটে, চশমা পরে—নিজের সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে সরকার জুয়েলারীতে দিন-দুপুরে ডাকাতি করেছেন।

চীৎকার করে উঠলেন রামদীপ লুল্লা। পাগলের প্রলাপ শুনতে এখানে আসিনি। আমি চললাম।

তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই বাধা দিলেন প্রেমকিশোর। দৃঢ় গলায় বললেন, বাইরে যাওয়া হবে না। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

—গ্রেপ্তার করলেই হল। আমি যে দোষী তার প্রমাণ কই ?

মৃদু হেসে শ্রীকান্ত বলল, আছে বইকি ! সবচেয়ে বড় ফ্যাক্ট হল সরকার জুয়েলারীর কাউণ্টারে আপনার ফিঙ্গার প্রিণ্ট পাওয়া গেছে। সেদিন থানায় এসে চেয়ারের হাতলে যে ছাপ রেখে গেছেন—তার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখেছি। দুটো প্রিণ্ট হুবহু মিলে গেছে। দুর্ঘটনাস্থলে যে লাইটার পাওয়া গেছে তাতেও আপনার হাতের ছাপ রয়েছে। এখানকার একজন দোকানদার লাইটারটি সনাক্ত করে বলেছে, এটি আপনি কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। রেলওয়ে

টি স্টলের একজন বয়কে আপনি টাকা দিয়ে হাত করেছিলেন। সে চা-এর সঙ্গে বিশেষ কিছু মিশিয়ে গার্ডকে অসুস্থ করে তুলেছিল। পুলিশ তাকে খুঁজে বার করবার পর সে সমস্ত কথা স্বীকার করেছে। যাক, আমার কথা শেষ হল। আপনাকে কোর্টে সোপর্দ করার দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশের। সে কাজ তাঁরা সুচারু রূপেই করবেন।

……দেখলে একবার ব্যাপারখানা? কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল! তোমরা মানুষেরা সত্যি অদ্ভুত। আর বকতে পারি না বাপু। আরেকদিন আবার তোমাদের শোনাব তোমাদের নতুন কীর্তিকথা।

● ● ●

আজ যে ঘটনাটি তোমাদের বলতে চলেছি, সেটি আবার একটু অন্য ধরনের। বন্দুকের গুলিতে নিহত একটি উত্তর-যৌবনা মেয়েকে আমার বুকের ওপর এনে শোয়ান হয়েছিল—তবে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না কোন ব্যভিচারী পুরুষের উন্মত্তার। আমি অবশ্য তখন অন্য মন নিয়েই বিষয়টিকে বিচার করেছিলাম।

১৯৬৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর।

বেশ শীত পড়েছে এবার। একথা শুনেছি অন্যের মুখ থেকে। আমার অনুভূতি থাকলে বুঝতে পারতাম, এই ঘরখানা কেমন শীতল হয়ে উঠেছে। গতকাল কোন মৃতদেহ আসেনি। ঘরেও কেউ ঢোকেনি। এমন কি ডোমেরাও নয়। এই লাশকাটা ঘর পরিষ্কার করার যে দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত আছে, সে সম্পর্কেও তারা উদাসীন। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কোথাও গুলতানি সারছে বোধহয় এখন।

আজ কিন্তু তাদের বিশ্রামসুখ উপভোগ করা হল না। বেলা এগারটার সময় একটি মৃতদেহ এল। মেয়েটির বয়স আন্দাজ ৩৭।৩৮। দোহারা গড়ন, সুরূপা না হলেও মুখের দিকে তাকান যায়। বুকের কাছে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। বুঝলাম হত্যাকারী নির্ভুলভাবেই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে।

সার্জেন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রেরা আমার দুপাশে এসে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর মুখে করণীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে লাগল সকলে। আমি মৃতা নারীটিকে নিজের বুকের ওপর নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, কেন একে খুন করা হয়েছে? উত্তর-যৌবনা হলেও, পুরুষের মনকে লোভাতুর করে তোলার ক্ষমতা এখনও কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। কোন দুরন্ত পুরুষ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাই কি……

প্রশ্নের উত্তর পেলাম দিন কয়েক পরে। হত্যাকারী ধরা পড়বার পর। ডাঃ ধরই কাহিনীটি শোনালেন সহযোগীদের, আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি

সেই অর্থ-লোলুপ হত্যাকারীর কাহিনী এবার তোমাদের শোনাব। আরম্ভ করি তাহলে—

ওয়ালিয়া শহর থেকে বহু দূরের একটি পার্বত্য গ্রাম। এখানে বাস করতেন প্রাক্তন সামরিক ক্যাপ্টেন রায়না। তাঁর কিছু জমিজমা ছিল। তাছাড়া তিনি ভেড়া প্রতিপালন করে বিক্রি করতেন। আয় মন্দ হত না। কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সময় তাঁর ভালই কাটছিল।

হঠাৎ তিনি কোন নোটিশ না দিয়েই হার্টফেল করে মারা গেলেন। অবশ্য বৃদ্ধ রায়না প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি রেখে গেলেন ছেলেমেয়েদের জন্যে। ছেলে-মেয়েরা কেউই জঙ্গলের মধ্যে বাস করতে চাইল না। যন্ত্র-সভ্যতার আকর্ষণে সকলেই চলে গেল শহরে। শুধু রিয়া—রায়নার প্রিয় কন্যা স্থানত্যাগ করল না। তার বয়স তখন তেত্রিশ। নারী হলেও দুর্জয় সাহস ছিল তার বুকে। পুরুষের মতই কন্যাকে গড়ে তুলেছিলেন রায়না। রিয়া তার আদরের কুকুর টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে চাষ-আবাদ আর ভেড়া প্রতিপালনের কাজেই ব্যস্ত রাখল নিজেকে। দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

এল ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস।

সেদিন ভোর হয়েছে সবে। তখনও চারদিক কুয়াশায় ঝাপসা। রিয়া বাগানের সামনেকার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। বিস্কুটের আশায় টাইগারও উন্মুখ হয়ে বসেছিল। এই সময় একজন আগন্তুক এসে দাঁড়াল। দীর্ঘকায় আগন্তুকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর।

হঠাৎ ইতস্ততঃ করে আগন্তুক চাকরির প্রার্থনা জানালে। সে শুনেছে এখানে নাকি একজন লোকের প্রয়োজন। কথাটা মিথ্যা নয়। রিয়া গ্রামের মাতব্বরকে কয়েকবার বলেছিল, ভেড়ার ব্যবসায় সহযোগিতা করবার জন্যে একজন কর্মঠ ও মোটামুটি শিক্ষিত লোক সে খুঁজছে। আগন্তুকের নাম সিন্ধে। কথাবার্তা বলার পর সিন্ধেকে খারাপ লাগল না রিয়ার। তার চাকরি হয়ে গেল।

দিন গড়িয়ে চলল। সিন্ধে মন দিয়েই কাজকর্ম করে। তবে সে বুঝতে পেরেছে, রিয়ার অনেক টাকা আছে। ব্যাঙ্ক দূরে থাকার দরুন ভেড়া বিক্রির টাকা সে কাছেই রাখে। বেশ কিছুদিন থেকে সিন্ধের বেশ অভাব যাচ্ছিল। আগে কাজ করত আসামের একটা চা-বাগানে। বেশ কিছুদিন কাজ করেছে ওখানে। সারাজীবনই কাজ করতে পারত। কিন্তু তা আর হল না। একদিন ম্যানেজারের হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেবার অপরাধে চাকরি তো গেলই—জেলও হল কয়েক মাস।

জেল থেকে বেরিয়ে নানা কাজ করেছে সিন্ধে। কিন্তু কোন কাজই স্থায়ী হয়নি। কাজের সন্ধানেই যত্রতত্র ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিল।

গ্রামবাসীদের কাছেই সে জানতে পারে রিয়ার খামারে চাকরি খালি আছে। এই সামান্য চাকরি করার ইচ্ছে তার ছিল না। শুধু চাকরি নিল, এই চমৎকার জল হাওয়ায় কিছুদিন বিশ্রাম পাবে ভেবে। এখন টাকার গন্ধ পেয়ে—সেগুলি করায়ত্ত না করে অন্যত্র যাওয়ার চিন্তা সে বাতিল করে দিল। তবে সে বুঝতে পেরেছিল কাজ খুব সহজে সম্পন্ন হবে না। রিয়া নারী হলেও অদ্ভুত সাহস তার। রিভলবার বা বন্দুক সব সময় কাছে কাছেই রাখে। তাছাড়া বিশাল কুকুরটি তাকে সব সময় পাহারা দিয়ে বেড়ায়। সিন্ধে মনে মনে প্ল্যান ভাঁজতে থাকে।

তার ভাগ্য ভাল ছিল। কোন পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হল না। সুযোগ এসে উপস্থিত হল নিজে থেকেই। সেদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সিন্ধে বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছিল। আধঘণ্টাটাক বিশ্রাম করে আবার কাজে যাবে। রিয়া খাওয়া দাওয়া সেরে, মিনিট দশেক হল টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে ভেড়াদের খোঁয়াড়েই গেছে। হঠাৎ সিন্ধের দৃষ্টি পড়ল, অফিস ঘরের ছোট আলমারির তালা খোলা। সে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঐ আলমারির মধ্যেই রিয়ার প্রিয় রিভলবার থাকে তার অজানা নয়। অসাবধানতায় আলমারি খোলা রয়েছে সন্দেহ নেই।

অস্ত্রটা কি এখন ওখানে আছে? না সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পুরুষালী স্বভাবের ঐ নারী? আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে সিন্ধে এগিয়ে গিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল। না—আছে। কালচে রু রং-এর কোল্টের রিভলবার রাখা রয়েছে একপাশে। সিন্ধের চোখ ঝকঝকিয়ে উঠল। এবার কার্যোদ্ধার করতে অসুবিধা হবে না। দুরেপাল্লার কোন অস্ত্র না থাকলে কি সুবিধা হয়।

সিন্ধে রিভলবার আলমারি থেকে বার করে নিয়ে বাগানে নেমে এল। তারপর বাগান থেকে বেরিয়ে নাম না জানা লতার ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ঝোপের সামনে যে সরু রাস্তা আছে ঐ রাস্তা দিয়েই রিয়া ফিরবে। সিন্ধে অপেক্ষা করতে লাগল। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না। হয়তো বিকেল হয়ে যাবার পর সে ফিরবে। অবশ্য বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না।

ঘণ্টাখানেক পরেই রিয়াকে আসতে দেখা গেল। বেশ নিশ্চিন্ত মনে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সে আসছে। মৃত্যু যে অদূরে ওৎ পেতে রয়েছে তাতো তার জানবার কথা নয়। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসতে লাগল।

প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সিন্ধে। শিহরণের অনুভূতিও তাকে জাপটে ধরল। রিয়া হাত চারেকের মধ্যে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের

ট্রিগার টিপল সে। টাইগার তখন বেশ কিছুটা পিছনে কি একটা মুখে নিয়ে আসছিল। গুলি লেগেছিল যথাস্থানেই। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রিয়া; কয়েক সেকেন্ড ছটফট করে চিরদিনের মত স্থির হয়ে গেল। দ্রুত ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করল সিন্ধে। না সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটি গুলিতেই মারা গেছে মেয়েটি।

ঠিক এই সময় টাইগার তাকে আক্রমণ করল। সিন্ধে লাথি মেরে তাকে সরিয়ে দিল। তারপর দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপল রিভলবারের। কিন্তু গুলি লাগল না টাইগারের গায়ে। সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সিন্ধে রিয়ার মৃতদেহ তুলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। নিজের বিছানায় মৃতদেহ শুইয়ে আবার চলে এল ঝোপের কাছে। মাটির ওপর প্রচুর রক্ত পড়েছে। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কোদালের সাহায্যে সেখানকার মাটি এলোমেলো করে দিয়ে, সেখানে কিছু খড় ছড়িয়ে দিল। দুর্ঘটনার সমস্ত চিহ্নই এইভাবে লুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব হল।

এবার সে রিয়ার শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু সিন্দুকের চাবি পাওয়া গেল না। অগত্যা ছেনি ও হাতুড়ির সাহায্যে অনেক পরিশ্রম করে সিন্দুকের ডালাটা ভাঙল সিন্ধে। সিন্দুকের ভেতরে হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া গেল। শ' দুয়েক পুরনো আমলের মোহরও পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল বেশ কিছু গয়না। এই বা কম কি। উৎফুল্ল সিন্ধে চিন্তা করে দেখল, বুঝে চলতে পারলে আগামী বেশ কয়েক বছর চমৎকারভাবে কাটবে। কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। যদিও গ্রামের বেশ কিছুটা দূরে এই বাড়ি, তবু কারুর পক্ষে হঠাৎ এসে পড়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে ভেড়া যারা দেখাশুনা করে তাদের মধ্যে কেউ এসে পড়তে পারে।

অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সিন্ধে কিন্তু তখনই এই স্থান ত্যাগ করল না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচাবার এক পরিকল্পনা ক্রমে তার মাথায় দানা বাঁধল। যদি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, রিয়ার মৃতদেহও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সে যে খুন হয়েছে বুঝতে পারা যাবে না। লোকে ভাববে কোনক্রমে বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ায় রিয়া পুড়ে মারা গেছে। বাড়িতে আগুন দিতে হলে, একটু রাত হবার পর আগুন দেওয়াই ভাল। গ্রামবাসীরা ঘুমিয়ে পড়বে। আগুন তারা দেখতে পাবে না। সহজেই সমস্ত কিছু ছাই হয়ে যাবে। ঘড়ির কাঁটা ক্রমে রাত এগারটায় এসে থামল। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নিশ্চয় গ্রামের কেউ এখনও জেগে নেই। চারদিকে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে সিন্ধে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আর অপেক্ষা নয়। টাকা, গয়না ও মোহরগুলি কিট্ ব্যাগে ভরে নিয়ে, রিভলভারটি পকেটস্থ করে—রিয়ার জীপে চেপেই সে অদৃশ্য হল।

ভালভাবে আগুন লাগান সম্ভব হয়নি, কাজেই বাড়িটা সম্পূর্ণ পুড়ল না। আধপোড়া অবস্থায় ধোঁয়াতে লাগল। দূরে থেকে সেই ধোঁয়া দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটে এল। হৈ হল্লায় ভরে উঠল চতুর্দিক। শেষে গ্রামের মোড়ল শহরে ছুটল খবর দিতে। খবর পেয়ে রিয়ার দাদা বিনায়ক এল আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে। নানা সূত্রে সংবাদ পেয়ে ইন্সপেক্টার দত্তও এলেন। রিয়ার ঝলসান মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। এইভাবে সিধের পুরো প্ল্যান সাফল্য লাভ করল না।

এই সময় টাইগার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। বিনায়কের কাপড় ধরে কোথায় নিয়ে যেতে চাইল। তার হাবভাব ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি বললেন, কুকুরটা কি বোঝাতে চাইছে আমাদের একবার দেখা দরকার।

টাইগারকে অনুসরণ করে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই সকলে সেই ঝোপের কাছে গিয়ে পেঁছালেন। সে সেখানকার মাটি আঁচড়াতে লাগল। ইন্সপেক্টার ঝুঁকে মাটি পরীক্ষা করতেই লক্ষ্য করলেন, চাপ চাপ রক্তের ওপর মাটি ও খড় ছড়ান রয়েছে। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল, রিয়াকে কেউ এখানে খুন করে দেহ বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে; তারপর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সকলের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করেছিল অন্যধারে। ইন্সপেক্টার সেই কথাই সকলকে বুঝিয়ে বললেন।

খুন !!!

এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি নিকটবর্তী শহরের অধিবাসীদেরও সচকিত করে তুলল। ইতিমধ্যে পুলিশও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছে। জানা গেছে, সিধে নামে একজন লোক চাকরিতে নতুন বহাল হয়েছিল—তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার শরীরের বর্ণনাও পুলিশ জানতে পেরেছে। এ ছাড়া জীপ ও সিন্দুক থেকে অস্থাবর মূল্যবান সামগ্রী যে চুরি গেছে তা অজানা থাকবার কথা নয়।

পুলিশ মহলেও হৈ চৈ পড়ে গেল। ধুরন্ধর গোয়েন্দারা সতর্কতার সঙ্গে হত্যা-রহস্যের জোরাল সূত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল। কোন কিছুর ওপর সন্দেহ হলেই খানাতল্লাস চলতে লাগল।

অনেক দিন পরে চুটিয়ে বিয়ারে হাবুডুবু খেল সিধে।

টাকাগুলো খরচ করেনি। গিনিগুলিও ভাঙ্গায় নি। রিয়ার কয়েকটি গয়না বিক্রি করেছে। বিক্রি করেছে কয়েকজন স্বর্ণকারকে। এতে অবশ্য কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। কারণ অল্প দামে চোরাই সোনা কিনে লাভজনক ফলাও ব্যবসা করছে অনেকেই। এ সমস্ত কথা পুলিশের কানে যাবার নয়।

কয়েকদিন মৌজে কাটাবার পর সিন্ধে এই শহর ছেড়ে, এমন কি এই প্রদেশ ছেড়ে সুদূর পাঞ্জাবে চলে যাবার মনস্থ করল। রিয়ার জীপ সে সঙ্গে রাখেনি। ওতে নিজের বিপদই ডেকে আনা হবে। যন্ত্রযানটি সে শহরের উপকণ্ঠে একটি ভাঙাচোরা বাড়ির আড়ালে রেখে এসেছে।

শহর ছেড়ে যাবার আগে আরো গোটাকয়েক গয়না বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে নেওয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল। অলক্ষ্যে বিধাতা হেসে-ছিলেন। ঐ বুদ্ধিমানের মত কাজটি করতে গিয়ে যে সিন্ধে ধরা পড়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি।

তখন বেলা এগারটা। অমৃতসর মেল ছাড়ে সন্ধ্যায়। হাতে এখন প্রচুর সময় আছে। যে দোকানে আগে গয়না বিক্রি করেছিল, সিন্ধে সেইদিকে চলল। দোকান বন্ধ। অগত্যা তাকে অন্য দোকানের সন্ধান দেখতে হল। ঐ পাড়ারই আরেকটি দোকানে সিন্ধে গিয়ে ঢুকল। সবেমাত্র পকেট থেকে নেকলেশটি বার করে মালিকের টেবিলের ওপর রেখেছে—কাউণ্টার থেকে কে একজন চাপা গলায় বলল, পুলিশ……

সিন্ধে ঝটিতে গয়নাটি পকেটের মধ্যে রাখতে গেল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। একজন সাব-ইন্সপেক্টার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সিন্ধেকে ধরবার জন্যেই যে পুলিশ এখানে এসেছে তা নয়, এই দোকানে চোরাই সোনার কারবার হয়ে থাকে এই সূত্র ধরেই তাদের আগমন। গ্রাহকদের আটকে রাখার উদ্দেশ্য পুলিশের ছিল না। সিন্ধে সহজেই দোকান থেকে বিদায় নিতে পারত, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। তার মুখের দিকে তাকিয়েই সাব-ইন্সপেক্টার সচকিত হলেন। প্রতি থানায় থানায় সিন্ধের চেহারার বর্ণনা পাঠান হয়েছিল।

সেই লোকটি নয়তো? সাব ইন্সপেক্টার দ্রুত চিন্তা করলেন। বাজিয়েই দেখা যাক না। তিনি নেকলেশটি তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। অন্য একজন অফিসার তখন দোকানের মালিককে জেরা করছেন। খাতাপত্র একত্রিত করা হচ্ছে। খানা তল্লাসীও এবার হবে।

—আপনি এখানে কি করছেন?

ভয় পেয়েও বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে সিন্ধে বলল, এই নেকলেশটা মডার্ন ডিজাইনের করতে এসেছিলাম এখানে।

—এটি নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর?

—স্ত্রী…মানে তাছাড়া আর কার হবে বলুন?

—কোথায় থাকেন?

—অরোরা নিবাসে।

—অরোরা নিবাস? তার মানে হোটেলে? চলুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক।

এবার বেশ ভয় পেয়ে গেল সিন্ধে।

—আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কেন! তিনি তো……

—এই নেকলেশটি তাঁর কি না আমার জানা দরকার।

—আপনি আমার ওপর জুলুম করছেন। আমি যখন বলছি…

—আপনার কথার সত্যতা আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে। এই গয়নাটি চোরাই মাল বলেই মনে হচ্ছে। তাছাড়া আপনার চেহারা…

সিন্ধে আচমকা সাব-ইন্সপেক্টারকে ধাক্কা মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ধাবিত হল। তার চেষ্টা সফল হবার কোন সম্ভাবনাই অবশ্য ছিল না। দরজার মুখে পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন কনস্টেবল তাকে জাপটে ধরল।

সিন্ধেকে আনা হল থানায়।

এর পর জটিলতা আর কিছু রইল না। নেকলেশটি সনাক্ত করল বিনায়ক। সিন্ধের পকেট থেকে পাওয়া গেল রিয়ার রিভলবার। তার আস্তানা তল্লাস করে গিনি ও অন্য গয়নাগুলিও পাওয়া গেল।

……ভেবে দেখ তোমরা কোথায় নেমে গেছ। সামান্য কিছু অর্থের জন্য একটি নারীকেও খুন করতে তোমাদের হাত কাঁপে না। অথচ আমি লাশকাটা টেবিল—আমার কাঠের বুক হু হু করে ওঠে। তোমাদের এই ন্যক্কারজনক কাহিনী, তোমাদেরই শোনাতে আমার খুব ভাল লাগে তা নয়। জানি অরণ্যেরোদন করে লাভ নেই। তোমরা কেউ বদলাবে না। তবু আমি তোমাদের উপদেশ দিতে থাকব, বিদ্রূপ করতে থাকব, ধিক্কার দিয়ে যাব।

* * *

আবার তাহলে আরম্ভ করি?

কিছু মনে করো না, তোমাদের কেমন যেন বেহায়া বলে মনে হয়! তোমাদেরই কত ন্যক্কারজনক কাহিনী আমি বলে যাচ্ছি—তোমরা নির্বিবাদে সেই সমস্ত শুনে যাচ্ছ!!! আমার কি, আমার বলে যেতেই আনন্দ। ডাঃ গুহর ছোঁয়াচ যেন আমারও লেগেছে।

খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়।

১৯১৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর।

একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুন্দরী তরুণীকে ধরাধরি করে ডোমেরা নিয়ে এল। অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। লক্ষ্য করলাম তার শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। এমন কি বিষের প্রভাবে মুখও কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেনি।

অথচ মেয়েটি যে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সে লাশকাটা টেবিলে আসবে কেন? শ্মশানে কখন এই

সুন্দর দেহখানি পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কেটে-ছিঁড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হল একসময়। জানা গেল মৃত্যুর জন্য দায়ী পটাসিয়াম সায়ানাইড।

এই মৃত্যুর নেপথ্য কাহিনী জানতে না পেরে আমি বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে রইলাম। সুইসাইড না হোমিসাইড—প্রকৃত ঘটনাটা কি? আমার উৎকণ্ঠা দূর হল দিন কয়েক পরে। মোটর এক্সিডেণ্টে একটি বছর তের বয়সের ছেলে মারা গিয়েছিল। তার পোস্টমর্টেম সেরে, ডাঃ গুহ বললেন সহযোগীদের সেই মেয়েটির কাহিনী। তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় যা বললেন, আমি হুবহু তাই তোমাদের শোনাচ্ছি।

সবে ভোর হয়েছে।

শীতের সকালে চান্দোরী একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

চারিধারের জমাট কুয়াশা সবে একটু পাতলা হয়েছে। বড় বড় গাছগুলির পাতা বেয়ে টপ টপ করে জল ঘাসের শিশিরের সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে। পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর এখন দেখা যায় না। একটু বেলায় যখন রোদ উঠবে, হাল্কা হলুদ রং-এ যখন ছেয়ে যাবে চান্দোরীর চারধার তখন দেখা যাবে পাহাড়টিকে। মেঘের টোপর পরে সে হয়তো তখন সকলের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কিন্তু এখন এত সমস্ত দেখার আগ্রহ মোটেই নেই এখানকার অধিবাসীদের। এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে কে বিছানা ছেড়ে উঠবে প্রয়োজনের তাগিদ না থাকলে? সকলে বেশ বেলাতেই উঠে থাকেন। তাই সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা সচল হতে এগারটা বেজে যায়ই।

অবশ্য আজ বেশ ভোরেই উঠেছেন প্রতাপনারায়ণ। এই অঞ্চলের টিম্বার কিং প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তবের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নিজের পাশাপাশি রেখেছেন তিনি। আবহমানকালই হুকুমের জোরে কাজ করিয়ে নেওয়া তাঁর অভ্যাস। তবে আজ যেন কাউকে কিছু হুকুম করবার আগেই নিজে কিছু করতে চলেছেন।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে লঘু পদে চিন্তিত মনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতাপনারায়ণ। তাঁর গন্তব্যস্থল অবশ্য বেঙ্গল অয়েল কোম্পানীর সিনিয়ার তৈল বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ সোমের কোয়ার্টার।

দেবাশীষ সোম।

একটা কাজ-পাগল লোক। তার সঙ্গে প্রতাপনারায়ণের আলাপের গভীরতা খুব কিছু গভীর নয়। তাই একটু মনে মনে ভয় পাচ্ছেন তিনি। তার প্রস্তাবের সপক্ষে সোমকে আনা যাবে কি না? তবে মিসেস সোম—বন্যা সোমের সঙ্গে মোটামুটি আলাপটা বেশ ভালই আছে প্রতাপনারায়ণের। তাঁর সাহায্যে যদি কিছু—। ব্যাপারটা একটু ভেঙে বলতে হয়।

সাঁওতাল পরগণার পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা একটি বিশেষ অঞ্চল হল চান্দোরী। পঞ্চাশ বছর আগেও এখানে জনবসতি ছিল না। প্রতাপনারায়ণের বাবা সূর্যনারায়ণই এই অঞ্চলে লোকসমাগমের সুযোগ করে দিলেন। পাহাড়ের তরাই অঞ্চলের বিরাট জঙ্গল থেকে চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দেবার ব্যবসা ফাঁদলেন তিনি। ক্রমে জনবসতি ঘন হল। শহরের পত্তন হল। এখন এটি স্বাস্থ্য সংগ্রহকারীদের একটি আকর্ষণীয় স্থান।

বেশ বৃদ্ধ বয়সেই সূর্যনারায়ণ গত হলেন। শিক্ষিত প্রতাপনারায়ণ অদ্ভুত কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসা চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুললেন--এই অঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠলেন বলা চলে।

কিন্তু এই প্রবাহ বজায় থাকল না।

হঠাৎ একদল লোক বহু যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হল। মাটির অভ্যন্তরে ড্রিল করে কি সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল তারা। খবরটা আর চাপা রইল না যে, এখানে তেলের সন্ধান পাওয়া যাবে।

তারপরই বেঙ্গল অয়েল কোম্পানী কলকাতা থেকে বহু কর্মচারী আর বিশেষজ্ঞ পাঠালেন এখানে। কলোনী গড়ে উঠল। অবশ্য এতে খুব বেশি দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না প্রতাপনারায়ণের। তিনি ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে এখন।

বিশেষ এক সরকারী সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন, তিনি যে অংশ থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন—তেল অনুসন্ধানের পরের ধাপ হল সেই অঞ্চল। কাজেই প্রতাপনারায়ণ যে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়বেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

তাই তিনি চলেছেন সিনিয়ার অয়েল এক্সপার্ট দেবাশীষ সোমের কাছে—যদি চাঁদির জুতা মেরে ওধারের কাজটা আপাততঃ ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল।

গন্তব্যস্থলেও পেঁছে গিয়েছিলেন প্রতাপনারায়ণ।

ছবির মত সুন্দর কোয়ার্টারটা দেবাশীষের।

কলিং বেলটা পুশ করলেন তিনি বার কতক।

ঝন ঝন শব্দ তুলে সুপ্ত গৃহের নীরবতাকে বার বার ভেঙে ভেঙে দিতে লাগল কলিং বেলের শব্দ। কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। আরো বার কতক বেল পুশ করলেন প্রতাপনারায়ণ। কোন সাড়া নেই।

বিচিত্র ব্যাপার।

বাড়িতে কেউ নেই? তা কি করে সম্ভব—বাইরে থেকে কড়ায় তো কোন তালা লাগানো নেই? এবার কলিং বেল থেকে হাত সরিয়ে এনে দরজার পাল্লাটায় চাপ দিলেন। অল্প একটু শব্দ তুলে খুলে গেল দরজাটা। একি!

এত অন্যমনস্ক মানুষ হয়! সারারাত দরজাটা খোলা রয়েছে অথচ কারুর কোন খেয়াল নেই?

একটু ইতস্ততঃ করে ঘরে প্রবেশ করলেন প্রতাপনারায়ণ।

বাইরের আলো থেকে ঘরে এসেই তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যদিও একটা হাল্কা পাওয়ারের আলো ঘরে জ্বলছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চোখ দুটো সয়ে এল তাঁর।

কিন্তু…ওকি…!

অর্ধচন্দ্রাকৃতি সোফাটার ঠিক সামনে কার্পেটের উপর কে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে যেন! কে ও! তিনি কম্পিত পায়ে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা দেহটার দিকে।

ঠিক সেই সময়ে…

ঠিক সেই সময় দপ করে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল।

চমকে সুইচ বোর্ডের দিকে মুখ ফেরালেন প্রতাপনারায়ণ। বিস্মিতভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে অসীম ধর।

দেবশীষ সোমের সহকারী অসীম আশ্চর্য হয়ে বলল, একি! মিঃ শ্রীবাস্তব, আপনি এই অসময়ে এখানে?

প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তব মুখে কিছু বললেন না, অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন দেহটার দিকে।

সেকেণ্ড কয়েক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেহটার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল অসীম। আর্তস্বরে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, মিসেস সোম! এখানে পড়ে রয়েছেন কেন?

—আমার ভাল ঠেকছে না মিঃ ধর—বললেন প্রতাপনারায়ণ, মনে হচ্ছে যেন মিসেস সোম…

—কি মনে হচ্ছে আপনার? উনি কি…

—হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে উনি বোধহয় মারা গেছেন।

পুলিশে খবর দেওয়া হল।

ঘরেরই একপাশে ফোন ছিল। তার সাহায্যে থানায় সংবাদ পাঠাতে বিশেষ অসুবিধা হল না। খবর পাওয়া মাত্র ইন্সপেক্টার চিনা সদলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। সতর্কতার সঙ্গে মিসেস সোমের দেহটা সোজা করে শুইয়ে দিলেন ইন্সপেক্টার। প্রতাপনারায়ণের অনুমান মিথ্যে নয়। বহুক্ষণ আগেই মারা গেছেন বন্যা সোম। সারা দেহে নেমেছে হিম শীতলতা।

কিন্তু দেহের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। এমন কি ধারে-কাছে গেলাস বা ওই ধরনের কিছুর সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না—যাতে অনুমান করা যায়

তিনি নিজে কিছু পান করে আত্মহত্যা করেছেন বা কেউ তাকে কিছু বলপূর্বক পান করিয়ে হত্যা করেছে।

শুধু মৃতদেহের খুব কাছে—পুরুষদেহের একটা কার্ডিগান পড়ে রয়েছে। বস্তুটি এমন কিছু সন্দেহজনক নয়, এই তুচ্ছ শীতবস্ত্রটি ইন্সপেক্টারের চোখ এড়িয়ে যাওয়ারই কথা। যেতও—যদি সেখানকার কোণের অংশ মিসেস সোমের মুঠির মধ্যে ধরা না থাকত।

ইন্সপেক্টার চিনা আবার মৃতদেহটা খুঁটিয়ে দেখলেন। মৃত্যু যে অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হয়তো কোচের উপর বসে-ছিলেন মিসেস সোম। আচম্বিতে মৃত্যু হওয়ায় গড়িয়ে পড়েছেন ওইভাবে। অসীম ধর ও প্রতাপনারায়ণ নির্বাকভাবে দাঁড়িয়েছিলেন একধারে।

দেবাশীষ সোমের ভৃত্য রামজীও ভীতভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে। এই মধ্যবয়স্ক লোকটি তার দীর্ঘজীবনে এইরকম শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পায়নি।

অবশ্য গৃহকর্তা সেখানে উপস্থিত নেই।

ইন্সপেক্টার চীনা এগিয়ে গেলেন রামজীর দিকে।

প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবু কি বাড়ি নেই?

যদিও খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল রামজী, তবু বেশ সংযত গলায় উত্তর দিল সে, আজ্ঞে তিনি কাল রাত ন'টার সময় বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায় গেছেন তুমি কিছু জান?

—চৌতারা গেছেন। তাঁকে প্রায় রাত্রে সেখানে যেতে হয়। এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে চৌতারাই বেঙ্গল অয়েল কোম্পানীর সব চেয়ে বড় ঘাঁটি, সেকথা জানতেন ইন্সপেক্টার।

—সাহেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তোমার মেমসাহেব কোথায় ছিলেন?

—এই ঘরেই ছিলেন। সাহেব চলে যাওয়ার পর তিনি নিজে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে স্টেশনে যেতে বললেন।

—স্টেশনে?

—আজ্ঞে।

—স্টেশনে কেন?

—স্টেশন মাস্টারকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে বলেছিলেন মেমসাহেব।

—ও। তুমি স্টেশন থেকে ফিরলে ক'টায়?

—আজ্ঞে, দেড়টা হবে। এতখানি পথ পায়ে হেঁটে···

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করলেন, বাড়ি ফিরেই কি তুমি শুয়ে পড়েছিলে?

—খিড়কি দরজার তালা খুলে আমি বাড়িতে ঢুকি। তারপর সোজা গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

তুমি এখান থেকে যেতে পার। তবে আমাদের অনুমতি ছাড়া এ'বাড়ির বাইরে যাবে না।

রামজী দ্রুত প্রস্থান করল ঘর থেকে।

ইন্সপেক্টার চিনা এবার ঘুরে দাঁড়ালেন প্রতাপনারায়ণের দিকে। বললেন, আপনার পরিচয় আমার অজানা নয় মিঃ শ্রীবাস্তব। তাই একটু আশ্চর্য হচ্ছি, এই সাত সকালে আপনার মত লোক এখানে কিভাবে উপস্থিত হলেন।

সঠিক কারণটা অবশ্য পুলিশের কাছে বলতে পারবেন না। কিন্তু সঙ্গত কারণ একটা দেখাতে না পারলে পুলিশ তাঁকে বেহাই দেবে না।

তিনি বললেন, মরনিং ওয়াকে' বেরিয়েছিলাম। এক সময় মনে হল মিঃ সোমের সঙ্গে এই ফাঁকে দেখা করলে মন্দ হয় না। দরজাটা খোলাই ছিল, ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য চোখে পডল।

—কিন্তু আপনি কিভাবে বুঝলেন মিসেস সোম খুন হয়েছেন? অজ্ঞান অবস্থাতেও তো মানুষ এইভাবে পড়ে থাকতে পারে?

—তা পারে। তবে পৃথিবীতে আমি অনেক ক'টা বছর কাটিয়েছি ইন্সপেক্টার। অনেক বিষয়েব অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম মিসেস সোম খুন হয়েছেন।

—এখানে আবার একটা টেকনিক্যাল প্রশ্ন উদয় হচ্ছে মিঃ শ্রীবাস্তব।

—কি প্রশ্ন, বলুন?

—আপনি বুঝতে পেরেছিলেন মিসেস সোম মারা গেছেন—কিন্তু তিনি যে খুন হয়েছেন এ সিদ্ধান্ত করলেন কেন?

একটু আমতা আমতা করে প্রতাপনারায়ণ বললেন, কোন সবল মহিলা ওইভাবে মরে পড়ে থাকতে পারেন না, নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুটা অস্বাভাবিকভাবে হয়েছে। ইন্সপেক্টার প্রতাপনারায়ণকে আর কিছু না বলে অসীম ধরের দিকে তাকালেন।

—আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও অজ্ঞাত।

—আমি অসীম ধর। দেবাশীষ সোমের সহকারী।

—ভোর হতে না হতেই বসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন?

অসীম বলল, মিসেস সোমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তিনি আমার সাহায্যে কলকাতা থেকে কিছু জিনিসপত্র আনাবেন বলেছিলেন। কি কি জিনিস আনতে চান তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

—আপনি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি?

—আজ বিকেলের গাড়িতে যাবার কথা আছে।

—এখন আর আপনার কলকাতা যাওয়া চলবে না। ভাল কথা, আপনি তো এই পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ, বলতে পারেন মিসেস সোম এইভাবে নিহত হলেন কেন ?

—না। তবে—

—তবে কি— ?

—দেখুন মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীতে অহরহ কত দুর্ঘটনাই ঘটছে, এক্ষেত্রে যদি—

—আপনি কি মিসেস সোমের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করছেন ?

অসীম ধর নীরব রইল।

—চুপচাপ থাকবার সময় এখন নয় মিঃ ধর। সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে আমায় বলুন।

—কারুর পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে আলোচনা করাটা কতদূর ভদ্রতাসম্মত সে বিষয়…।

—আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। এ একটা সামাজিক দায়িত্ব। রহস্যাবৃত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্যজাল অবিলম্বে ছিন্ন হোক এই আমরা চাই। আপনি বলুন।

অসীম বলল, কলকাতার অনেকগুলি হাই সোসাইটিতে মিসেস সোমের যাতায়াত ছিল। তিনি এখানে থাকতে চাইতেন না। এমনকি অনেক সময় তাঁর পুরুষ বন্ধুরা মাসের পর মাস তাঁকে নিয়ে ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। আমি এও শুনেছি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মিসেস সোমকে অনেক সময় মিঃ সোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন।

—আপনি বলতে চাইছেন বহু পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত নারীর জীবনের পরিণাম এই রকমই হয় ?

—নজিরের অভাব নেই ইন্সপেক্টার।

—তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, মিঃ সোমের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না।

এই সময় বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

ইন্সপেক্টার চিনা দেখলেন, প্রিয়দর্শন দীর্ঘদেহী একজন লোক দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করছে। তিনি অনুমান করলেন ইনিই গৃহকর্তা দেবাশীষ সোম। ঘরে ঢুকে দেবাশীষ অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে—?

অসীম বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে মিঃ সোম। ওই দেখুন।

বন্যার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল দেবাশীষ। একটা নিটোল মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল।

এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যে সম্পূর্ণ যেন তলিয়ে গেছে দেবাশীষ।

ইন্সপেক্টার চিনা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আমার নেই মিঃ সোম, তবে—

—আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না ইন্সপেক্টার। বন্যা এইভাবে মারা যাবে, এ যে—

কথাটা শেষ না করেই সোফার উপর বসে পড়ল দেবাশীষ।

প্রতাপনারায়ণ বললেন, অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপার সময় সময় আমাদের এইভাবে বিভ্রান্ত করে তোলে মিঃ সোম।

—কর্তব্যের খাতিরে আমি গোটাকতক প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। ইন্সপেক্টার বললেন।

চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল দেবাশীষ, বলুন।

—কাল আপনি বাড়ি থেকে ক'টায় বেরিয়েছিলেন ?

জাস্ট ন'টায়।

—সোজা কর্মস্থলে গিয়েছিলেন না অন্য কোথাও থেকে ঘুরে ফিরে—

—সোজা আমি কাজে গিয়েছিলাম। সারারাত ওখানেই ছিলাম। এই কিছুক্ষণ আগে ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান বিকাশবাবুর কাছ থেকে ফোন পেলাম—আমার কোয়ার্টারে নাকি পুলিশ এসেছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম কি ব্যাপার দেখবার জন্যে।

—কিন্তু আপনাদের বিকাশবাবু তো এখানে একবারও আসেননি।

—আমার কোয়ার্টারের সামনেই তাঁর কোয়ার্টার। তিনি নিশ্চয়ই নিজের কোয়ার্টার থেকেই আপনাদের প্রবেশ করতে দেখেছেন।

—তা অবশ্য হতে পারে। আপনার স্ত্রীকে কে হত্যা করেছে আপনি অনুমান করতে পারেন ?

—এ আমার ধারণার অতীত ইন্সপেক্টার।

—ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—আমি সংবাদ পেয়েছি, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না, তাই না ?

একটু ইতস্ততঃ করে দেবাশীষ বলল, খুব যে শোচনীয় ছিল তাও আবার না। আসল কথা বন্যা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিল। তার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ছিল। আর দশটা মেয়ের মত স্বামী ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার পাত্রী সে ছিল না।

—কোন স্বামীরই এধরনের স্ত্রী কাম্য নয়। ইন্সপেক্টার বললেন—কাজেই আপনি কি খুবই হ্যাপি ছিলেন ?

—প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে ইন্সপেক্টার।

—একটা খুনের তদন্ত করতে এসে অনেক রকম প্রশ্নের অবতারণা করতে হয় দেবাশীষবাবু। বিশেষত এধরনের কেসে, যেখানে আনহ্যাপি স্বামী—

—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন। দেবাশীষ আকাশ থেকে পড়ল।

—শেষটা আমাকে—

—আপনাকে সন্দেহ করছি এ কথা আমি একবারও বলিনি। যাক্, এই কার্ডিগানটা আপনার ?

চেস্টনাট কালারের কার্ডিগানটা তুলে ধরলেন ইন্সপেক্টার।

—না।

ইন্সপেক্টর চিনা আর কিছু বললেন না। ফটোগ্রাফারকে আগেই ডাকা হয়েছিল। তাকে নির্দেশ দিলেন গোটা কতক স্ন্যাপ নিতে। মৃতদেহ ও ঘরের অন্যান্য অংশের। তারপর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে চালান দেওয়া হল।

সারাটা দিন গভীর চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল ইন্সপেক্টার চিনার। এই ধরনের রহস্যজনক খুনের মুখোমুখি তিনি কোনদিনই হননি। এখানে যে খুন-জখম না হয় তা নয়, বরং একটু বেশি মাত্রাতেই হয়। তবে সেগুলোর মধ্যে কোন রহস্য থাকে না। জমিজমার গোলমাল বা রাগারাগি করে মানুষ মানুষকে খুন করে। কিন্তু এ তো তা নয়।

হত্যাকারী কে সে প্রশ্ন এখন বড় নয়। হত্যাকারীর মোটিভ কি তাই আগে জানা দরকার। হঠাৎ ইন্সপেক্টার চিনার একটা কথা মনে পড়ল। জেরার মুখে রামজী বলেছিল, সে নাকি একটা চিঠি স্টেশন মাস্টারের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

মিসেস সোম স্টেশন মাস্টারকে চিঠি লিখেছিলেন কেন ? এই প্রথম, না আরো চিঠি আগেও লেখা হয়েছিল। মনে হচ্ছে একটা সূত্রের ঝিলিক যেন দেখতে পাচ্ছেন ইন্সপেক্টার।

তিনি আর কালবিলম্ব না করে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অন ডিউটিতেই পাওয়া গেল স্টেশন মাস্টারকে। প্রৌঢ় খৃস্টান ভদ্রলোক। ইন্সপেক্টার চিনা মিসেস সোমের নিহত হওয়ার কথা বলে এবং সেই তদন্ত ভার তিনিই গ্রহণ করেছেন একথা তাঁকে জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, মিসেস সোমের কাছ থেকে কাল যে চিঠিখানা তিনি পেয়েছেন, সেখানা কোথায় ?

একটা খাম ড্রয়ার থেকে বার করলেন স্টেশন মাস্টার।

খামের উপর সুছাঁদ অক্ষরে লেখা রয়েছে, রজত পাল চৌধুরী। আর্কিটেক্ট।

কলিকাতা-১৬

ইন্সপেক্টার খামখানা নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আপনার কাছে এই চিঠি পাঠাবার উদ্দেশ্য কি ?

—একজন না একজন স্টাফকে প্রায়ই কলকাতায় যাওয়া আসা করতে হয়।

কারুর হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিই। এইভাবে অনেক চিঠিই মিসেস সোম পাঠিয়েছেন কলকাতায়।

—কিন্তু পোস্ট অফিস থাকতে—

—এ প্রশ্ন আমার মনেও বহুবার জেগেছে ইন্সপেক্টার। প্রৌঢ় স্টেশন মাস্টার বললেন, আসলে বন্যা আমার বন্ধুকন্যা। সে একদিন স্টেশনে বেড়াতে এসে আমায় দেখতে পায় এবং তারপরই কথা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করে তার চিঠিপত্র আমার থ্রু সে কলকাতায় পাঠাবে।

বেলা তখন ন'টা।

আরো দু-চার কথার পর ইন্সপেক্টার স্টেশন থেকে বিদায় নিলেন।

তবে এসম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এই কেস একা তাঁর পক্ষে সামলানো বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এখন হোমিসাইড স্কোয়াডে খবর পাঠানোই হল বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ কেসটা নিজের হাতে রেখে শেষ পর্যন্ত যদি কিনারা করতে না পারেন তাহলে উপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে করতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে।

থানায় পেঁছেই সদরে খবর পাঠালেন। ফোনে এই কেস সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বলবার বললেন। ওখান থেকে আশ্বাস পাওয়া গেল আগামীকালই হোমিসাইড স্কোয়াডের তরুণ সুযোগ্য কর্মচারী বিনয় দত্তকে পাঠানো হচ্ছে।

চান্দোরী নামে কোন স্টেশন নেই। দিওয়ারগঞ্জে ট্রেন থেকে নামতে হয়। এখান থেকে একটা পিচঢালা পথ চান্দোরী পর্যন্ত গেছে। ব্যবধান মাইল পাঁচেকের বেশি নয়। সবে ভোর হয়েছে। চারধারে কুয়াশার দুর্ভেদ্য বেড়াজাল। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ঠ ঠাণ্ডা বিনয়কে সাপটে ধরল।

সদর থেকে কেসের তদন্ত ভার নিয়ে ও আসছে।

লম্বা ঝাপসা প্ল্যাটফর্মে কাউকে চোখে পড়ে না। এই ঠাণ্ডায় কার মনে পুলক জাগবে যে, এখানে ঘোরাঘুরি করবে? বিনয় নিজের সুটকেশ আর বেডিংটা কোন রকমে বয়ে গেটের কাছে নিয়ে এল। এই সময় জীপ থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে ইন্সপেক্টার এলেন।

দুজনের কেউ কাউকে আগে দেখেননি। তবে সহজেই দুজন দুজনকে চিনে ফেললেন। এরপর চান্দোরীতে পেঁছাতে বিনয়ের বিশেষ অসুবিধা হল না।

থানাতেই বিনয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, জলযোগ সেরে নিয়ে সে ইন্সপেক্টারের সঙ্গে আলোচনায় বসল। শরীর যদিও বেশ ক্লান্ত। আরো একটু বিশ্রাম করে নিলে

মন্দ হত না। আসল কথা, অহেতুক সময় নষ্ট করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। খুঁটিয়ে ঘটনাটা আগে জেনে নেওয়া দরকার। ইন্সপেক্টার চিনা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে সমস্ত কিছু বিনয়কে বললেন। স্টেটমেণ্টের রিপোর্টটাও পড়তে দিলেন। স্টেটমেণ্টগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিনয় বলল, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে ?

—কাল সন্ধ্যায় পেয়েছি। সায়নাইডের সাহায্যে মহিলাটিকে হত্যা করা হয়েছে।

—হুঁ। আচ্ছা আপনি স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে যে চিঠিখানা নিয়ে এসেছিলেন, দেখি একবার সেখানা।

ইন্সপেক্টার চিনা ড্রয়ার থেমে খামটা বার করলেন। কয়েক ছত্র মাত্র লেখা—

রজত,

বার বার তুমি আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিও না। আজ আমি অন্যের স্ত্রী, তোমার বন্ধুপত্নী। একথা তুমি কেন ভুলে যাও।

আমি তোমায় অনুরোধ করছি, শান্তিতে ক'টা দিন বাঁচতে দাও।

বন্যা।

—কি বুঝলেন চিঠিখানা পড়ে ?

বিনয় বলল, কয়েকটা কথা খুবই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। যেমন, রজত পাল চৌধুরীর সঙ্গে বন্যা দেবীর ভালবাসা ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর বিয়ে হল দেবাশীষ সোমের সঙ্গে। বন্ধুপত্নী কথাটার উল্লেখ দেখে মনে হয়, দেবাশীষবাবুর বন্ধু হলেন রজতবাবু। এখন—

—আপনি বলতে চান বিয়ের পর বন্য দেবীকে রজতবাবু ব্ল্যাকমেল করছিলেন।

—চিঠি পড়ে আমি তাই অনুমান করছি।

—তাহলে রহস্যটা তো অনেক সরল হয়ে এল। দেবাশীষবাবুর কাছ থেকে রজত পাল চৌধুরীর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে……

—তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন ? কিন্তু ইন্সপেক্টার, এখানে যে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে মেরে ফেলে যে সোনার ডিম সংগ্রহ করে তার লাভ কি বলতে পারেন ?

—আপনি বলতে চাইছেন এই তদন্ত থেকে রজত পাল চৌধুরীকে বাদ দিলেও চলে।

—অনেকটা তাই। বন্যা দেবী বেঁচে থাকলেই রজত পাল চৌধুরীর পক্ষে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করার বিশেষ সুবিধা। বন্যা দেবীকে খুন করলে সে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই—। যাক আমরা এখন

উঠলাম। ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পাওয়া কার্ডিগানটা আমায় পাঠিয়ে দেবেন। এসো ডাক্তার—

বিকেলের দিকে দেবাশীষ সোমের কোয়ার্টারে এল বিনয়। দেবাশীষ মুহ্যমানের মত বসেছিল বারান্দায়। বুঝতে পারা গেল বিনয়ের আগমন সংবাদ তার অজানা নয়। পুলিশের পক্ষ থেকেই বোধহয় জানান হয়েছে।

—আপনাকে আমি বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। বিনয় বলল, আপনি শুধু আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে আমাকে সাহায্য করুন।

—কি সাহায্য চান বলুন?

আপনি একটু খোঁজ করে দেখুন, আপনার স্ত্রীর মূল্যবান কিছু হারিয়েছে কি না। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। আপনি ভেতরে গিয়ে দেখে আসুন।

দেবাশীষ বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ফিরে এল মিনিট কুড়ি পরে। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—মূল্যবান কিছু খোয়া গেছে যেন মনে হচ্ছে?

—আপনি যা অনুমান করেছেন তা নয়। দেবাশীষ বলল, সমস্তই ঠিক আছে। তবে এমন একটা জিনিস চুরি গেছে যার—

—কোন দলিল-পত্র কি?

—দলিল নয়। একটা প্রলাপে ভরা কাগজ বলতে পারেন।

—অর্থাৎ—আমায় সমস্ত কিছু খুলে বলুন মিঃ সোম।

—তাহলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমার ঠাকুর্দা বাংলার ইতিহাসের একজন অথারিটি ছিলেন। সারাটা জীবন তিনি ইতিহাসের মধ্যে ডুবেই কাটিয়ে দিলেন। মারা যাবার ৬।৭ দিন আগে আমাকে ডেকে একটা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, এই নির্দেশটা রাখ। আমার হিসেবমত সাঁওতাল পরগণার এক অঞ্চলে প্রচুর ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেই কাগজটাই চুরি গেছে দেখছি।

—কাগজটায় কি লেখা ছিল মনে আছে?

—নক্সার মত খানিকটা কাটা ছিল। আর ছিল কতকগুলো হিজিবিজি অঙ্ক। অবশ্য আমি কোনদিনই কাগজটাকে কোন গুরুত্ব দিইনি।

চিন্তিত গলায় বিনয় বলল, এ বিষয় আপনি কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কখনও।

—কাউকে আমি এবিষয়ে কিছু বলিনি।

—আচ্ছা মিঃ সোম, রজত পাল চৌধুরী আপনার বন্ধু না?

—হ্যাঁ।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা আপনি জানতেন ?

—জানতাম। কিন্তু আমি ওদের একথা জানতে দিইনি। খুবই অসুখী বিবাহিত জীবন আমার ছিল মিঃ দত্ত।

—হুঁ। আপনার দাদুর দেওয়া ওই কাগজটা থাকতো কোথায় ?

—আলমারীতে।

—আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি একবার ইন্সপেক্টার চিনাকে ফোন করুন। উনি যেন এখুনি প্রতাপনারায়ণ ও অসীম ধরকে নিয়ে এখানে চলে আসেন।

দেবাশীষ ফোন করতে চলে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে ইন্সপেক্টার চিনা প্রতাপনারায়ণ ও অসীম ধরকে নিয়ে এলেন। বিনয় ওদের গোটাকতক প্রশ্ন করল। তারপর বন্যা সোম যে ঘরে নিহত হয়েছেন, সেই ঘরটি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

পুলিশের পক্ষ থেকে তালা দেওয়া ছিল ঘরখানায়।

ইন্সপেক্টার চিনা তালা খুললেন।

খুঁটিয়ে ঘরটা দেখল বিনয়।

মেঝেতে পুরু কার্পেট। সেণ্টার টপ টেবিলটাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটা বেতের চেয়ার একধারে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি সোফাটা ঘরের আরেক প্রান্তে।

ইন্সপেক্টার দেখিয়ে দিলেন—এখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন বন্যা সোম। বিনয় হাঁটু গেড়ে বসে কার্পেটের ওই অংশটা পরীক্ষা করতে লাগল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে ওর নজরে পড়ল, কার্পেটের খাঁজে একটা ছুঁচ আটকে রয়েছে। বিনয় সন্তর্পণে সেটা তুলে নিয়ে পকেটস্থ করল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কার্ডিগানটা কার, কিছু সন্ধান পেয়েছেন ?

—না। লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেটা, পেয়েছেন কি ?

—হ্যাঁ। এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। আমি এবার হোটেলে ফিরব।

হোটেলে ফিরে এসে সবে নিজেদের ঘরে বসেছে ওরা, এমন সময় প্রতাপ-নারায়ণ ঘরে প্রবেশ করলেন।

—আপনি যে আসবেন তা আমি জানতাম মিঃ শ্রীবাস্তব।

—আপনি জানতেন !!

—আপনার উসখুস ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি আমায় কিছু বলতে চান।

—ওই কার্ড়িগানটার সম্বন্ধেই আপনাকে কিছু বলতে চাই।

—বলুন ?

—আমি জানি ওটা কার ?

—কার ?

—অসীম ধরের।

—আপনি ঠিক জানেন মিঃ শ্রীবাস্তব ?

—আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি না মিঃ দত্ত। হপ্তাখানেক আগে বাজারের একটা দোকানে গরম কাপড় কিনতে ঢুকেছি, লক্ষ্য করলাম অসীমবাবু ওই কার্ডিগানটা কিনছেন। তিনি অবশ্য আমায় দেখতে পাননি।

—একথা পুলিশকে তো আপনি বলেননি ?

—না। একথা আগে পুলিশকে বলতে আমার মন সায় দেয়নি। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা এই উক্তি আমার মনে ছিল।

—যাক, শেষ পর্যন্ত যে আমায় বলেছেন তাতেই আমি আনন্দিত। মিসেস সোমের খুন হওয়া সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—দেখুন—থেমে থেমে বললেন প্রতাপনারায়ণ, তাঁর মত চরিত্রের মেয়েকে নিয়ে এতদিন যে কোন খুনোখুনি হয়নি তাতেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

—আপনি রজত পাল চৌধুরীর সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করছেন ?

ফিকে হাসলেন প্রতাপনারায়ণ।—আপনি একজনের কথা জানেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা গড় গড় করে একগাদা নাম করে যাবে।

বিনয় আর কোন প্রশ্ন করল না। চিন্তিত মুখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অগত্যা শ্রীবাস্তব বিদায় নিলেন। আলোচনার মধ্যেই ইন্সপেক্টার এসে পড়েছিলেন। এতক্ষণ তিনি কোন কথাই বলেননি।

বিনয় একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয় লোকটা সত্যি কথা বলে গেল ?

—মোটামুটি বোধহয় সত্যিই বলেছে। আমি শুধু ভাবছি শ্রীবাস্তব আর কিছু বলতে এসেছিল, না ওই কথাটাই শুধু জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল ?

বিনয় একথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, মিসেস সোমের মৃত্যুটা কিভাবে হয়েছে বলে আপনার ধারণা ?

—কেন ? পটাশিয়াম সায়নাইডের সাহায্যে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট থেকে তো সেই কথাই জানা গেছে।

—তা তো জানিই। আমি বলতে চাইছি কিভাবে তাঁকে সায়নাইড খাওয়ানো হয়েছিল ? কিভাবে খাওয়ানো হয়েছিল জানেন ? ওই যে কার্ডিগানটা······

উত্তেজিতভাবে ইন্সপেক্টার বললেন, কি বলছেন আপনি ?

—সত্যের অপলাপ করছি না। ঘটনাস্থল থেকে একটা ছুঁচ কুড়িয়ে পেয়েছি নিশ্চয়ই জানেন ? ওই ছুঁচটা সেদিন হত্যাকারীর প্রধান সহায়ক ছিল। বুঝতে পেরেছেন বোধহয় আমি কি বলতে চাইছি। কার্ডিগানটি আমি

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, পরিধেয়টি সম্পূর্ণ নতুন হলেও তার একটা বোতাম সম্প্রতি টাঁকা হয়েছে। এবার ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত সোজা হয়ে গেল। বোতাম অর্ধেক টাঁকা অবস্থায় মিসেস সোম মারা যাননি, তিনি মারা গেছেন……

ইন্সপেক্টার উত্তেজিতভাবে বললেন, আপনি বলতে চান, বোতামে সায়নাইড মাখানো ছিল ?

—ঠিক তাই। বোতামটা ফিক্সড হয়ে যাবার পর সুতোটা যখন মিসেস সোম দাঁতের সাহায্যে কেটে নিচ্ছিলেন তখনই জিভ বোতামের সঙ্গে ঠেকে যাওয়া মাত্র তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এখন প্রশ্ন উঠবে, অসীমবাবুর কার্ডিগানের বোতাম মিসেস সোম টেঁকতে গেলেন কেন ? এই কেনর উত্তরটা আমাদের এখন খুঁজে বার করতে হবে। আমি একটা এক্সপেরিমেণ্টের কথা ভাবছি।

—কিসের এক্সপেরিমেণ্ট ?

বিনয় একথার উত্তর না দিয়ে বলল, আমাকে এখুনি একবার বাজারে বেরুতে হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব। আপনি ইতিমধ্যে প্রতাপনারায়ণ-দেবাশীষ সোম আর অসীম ধরকে এখানে ডেকে পাঠান।

বেলা তখন পাঁচটা।

থানায় একত্রিত হয়েছেন সকলে।

প্রতাপনারায়ণ, দেবাশীষ সোম, অসীম ধর ও ইন্সপেক্টার পর পর বসেছেন। বিনয় ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব। সকলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বিনয় বলল, আপনাদের এখানে এইভাবে ডেকে পাঠানোর জন্য আমি মর্মাহত। যাই হোক, এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, এই ধরনের একটা তদন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমায় বলতে হচ্ছে, আপনারা আমার সঙ্গে যে শুধু সহযোগিতা করেননি তাই নয়, আমাকে বিপথে চালিত করবার চেষ্টাও করেছেন।

—আমাকে ও দলে টানবেন না। আমি আপনাকে সব সময় সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি। প্রতাপনারায়ণ বললেন।

—তা হয়তো করেছেন। আবার ওই সঙ্গে সুচারুভাবে একটা কথা আগাগোড়া চেপে গেছেন।

—চেপে গেছি ?

—নিশ্চয়ই। আপনি দুর্ঘটনার দিন আন্দাজ রাত্রি ন'টার সময় মিঃ সোমের বাড়িতে গিয়েছিলেন—কই, এ কথা তো আমার কাছে বলেননি ?

—আমি……

বিনয় গলার জোর দিয়ে বলল, অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেয়ে এ কথা আমি বলছি না।

এবার প্রতাপনারায়ণ অসহায় গলায় বললেন,—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। সেটা এমন কি দোষণীয় কাজ হয়েছে বুঝতে পারছি না।

বিনয় বলল, ওয়েল ইন্সপেক্টার, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে মিসেস সোমের মৃত্যুর সময় কখন নির্দেশ করা হয়েছে?

—রাত নটা থেকে দুটোর মধ্যে। ইন্সপেক্টার চিনা বললেন।

—কাজেই মিঃ শ্রীবাস্তব আপনি ভেবে দেখুন রাত নটার সময় মিঃ সোমের বাড়ি যাওয়া আপনার পক্ষে কতটা গুরুতর কাজ হয়েছে। আমি আরো সংবাদ পেয়েছি, সে সময় আপনার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। ব্যাগের মধ্যে আপনি কি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এখন বলবেন কি?

একটু ইতস্ততঃ করে প্রতাপনারায়ণ বললেন,—ক্যামেরা। ফ্ল্যাস হোল্ডার-যুক্ত একটা ক্যামেরা।

এই সময় দেখা গেল অসীম ধর উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেন কিছু বলতে চায়।

বিনয় তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বসুন মিঃ ধর। আপনার সঙ্গেও আমার কথা আছে।

অসীম ধর আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

—দুর্ঘটনার পর জবানবন্দী নেবার সময় বিনয় বলল, ইন্সপেক্টার চিনা মিঃ সোমকে প্রশ্ন করেছিলেন কার্ডিগানটা তাঁর কিনা। আপনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, অথচ স্বীকার করলেন না, ওই শীত বস্ত্রটি আপনারই। কেন বলতে পারেন?

আমতা আমতা করে অসীম ধর বলল, না…দেখুন…মানে…

—ওইভাবে কথা এড়িয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই মিঃ ধর। যদিও আমি ভগবান নই—তবুও জানবেন, আপনারা আমার কাছে কোন কিছু স্বীকার না করলেও, আমি যথাসময়ে সমস্ত কিছু জানতে পারব।

—কিন্তু ও কার্ডিগানটা আমার নয় মিঃ দত্ত।

—আপনার নয়? তবে যে মিঃ শ্রীবাস্তব আমায় বলেছিলেন, ওই কার্ডি-গানটা আপনাকে তিনি কিনতে দেখেছেন।

—কে, মিঃ শ্রীবাস্তব আপনাকে বলেছেন? অসীম ধর জ্বলন্ত চোখে প্রতাপনারায়ণের দিকে তাকাল।—সর্বঘটেই আপনি আছেন দেখা যাচ্ছে। না, ওই কার্ডিগানটা আমায় কিনতে আপনি দেখেননি।

—দেখেছি বৈকি—নিশ্চয়ই দেখেছি,—টেনে টেনে বললেন প্রতাপনারায়ণ,

—দেখুন, আমি ব্যবসাদার লোক। মিথ্যে কথা বলা অবশ্য আমার অভ্যাস আছে, তবে এক্ষেত্রে আমি মিথ্যে কথা বলিনি।

—মিঃ শ্রীবাস্তব, আপনি নিজের অধিকারের বাইরে পা বাড়িয়েছেন। আপনার—

—মিথ্যে কথাকাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। বিনয় বলল, আপনাদের আর আমি ধরে রাখব না। তবে মিঃ শ্রীবাস্তবকে আমি শেষবারের মত বলব, তিনি ফ্ল্যাসের সাহায্যে যে ছবিটা সেদিন তুলেছিলেন—যাতে হয়তো হত্যাকারীর ছবি আঁকা হয়ে গেছে—সেখানা কাউকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে না রেখে আমাকে যেন দেন।

কারুর মুখে কথা নেই।

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব নেমে এল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর বললেন প্রতাপনারায়ণ,—ছবিটা এখনও ডেভলাপ করা হয়নি।

—তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি কাল সকালের মধ্যে ফিল্ম রোলটা আমাকে দিয়ে যাবেন।

এরপর আর কোন কথা হল না। একে একে সকলে বিদায় নিলেন।

রাত তখন বোধহয় এগারটা হবে।

প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে মিসমিসে কালো অন্ধকার একেবারে মিলেমিশে গেছে। বিরাট দোতলা বাড়িটা অন্ধকারের মধ্যেই সম্পূর্ণ গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ক্রমে সাড়ে এগারটা, তারপর বারটা বেজে গেল। সাড়ে বারটা বাজল এরপর। মৃদু পায়ের শব্দ হচ্ছে একটা। কে যেন বাগানের দিক থেকে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ভারী একটা ওভারকোট গায়ে মুড়ে আগন্তুক বাড়ির পিছন দিকে এসে দাঁড়াল।

একটা পেয়ারা গাছের সাহায্যে আগন্তুক উঠানে নেমে গেল। উঠান পার হয়ে দালানে উঠল সে। আগন্তুকের পদক্ষেপ দেখে মনে হয় এ বাড়িতে সে পূর্বে এসেছে। দালানের শেষের দিকের ঘরটার দরজায় গিয়ে একটু চাপ দিল সে। খুলে গেল দরজাটা। আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করল।

কয়েকটা ঘর পার হয়ে বোধহয় নির্দিষ্ট ঘরে এসে থামল আগন্তুক। পকেট থেকে টর্চ বার করে সে জ্বালল বার কতক।

ওই তো—তার আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি রয়েছে ম্যাণ্টলপিসের উপর। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলোটা।

বিনয় সুইচ বোর্ডে হাত রেখেই বলল,—আপনি রং স্টেপ নিয়েছেন মিঃ

সোম। ক্যামেরার মধ্যে কোন ফিল্ম নেই। প্রতাপনারায়ণ কোন ছবি তোলেননি।

ক্যামেরাটা হাতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল দেবাশীষ সোম। তার চোখদুটো তখন ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত জ্বলছে। ঘরের বাইরে ভারী জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

সদলে ঘরে প্রবেশ করলেন ইন্সপেক্টার চিনা।

—ইন্সপেক্টার, আপনার আসামী আপনার সামনে উপস্থিত। মিসেস সোমের হত্যার অপরাধে আপনি মিঃ সোমকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। উনি নিজের চালে নিজেই ধরা পড়েছেন। আমি মিঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে পরামর্শ করে ছবি তোলার গল্পটাকে খাড়া করেছিলাম। মিঃ সোমকে টেস্ট করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। মিঃ সোম সত্যিই ভেবে নিয়েছিলেন মিঃ শ্রীবাস্তব বুঝি মিসেস সোম নিহত হওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত থেকে. কোনক্রমে ছবি তুলে নেন। তাই তিনি এখানে এসেছিলেন ফিল্ম রোলটা চুরি করতে—নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে।

ইন্সপেক্টার চিনা এগিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিলেন দেবাশীষের হাতে।

*　　　*　　　*

আমার বয়স হল। ডোমেরা একদিন বলাবলি করছিল আমার চারটে পায়াই নাকি একটু একটু নড়ছে। এই টেবিলের উপর লাশ রেখে কাটাকুটি আর বেশি দিন বোধহয় সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আমাকে বাতিল করে নতুন লাশকাটা টেবিল এই ঘরে আনার দিন প্রায় এসে গেছে।

আমার নিরেট কাঠের বুকও কেঁপে উঠল। এই ঘর থেকে আমায় বার করে রোদবৃষ্টির মধ্যে ফেলে রাখবে না তো! তারপরই নিজেকে সামলে নিলাম। যা ভাগ্যে আছে তা তো হবেই। ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি? তারচেয়ে বরং তোমাদের কেচ্ছাকাহিনী তোমাদেরই শুনিয়ে যাই। এতে আমার কোন লাভ হবে না জানি, কিন্তু তোমাদের যদি চৈতন্যোদয় হয়, তোমরা যদি নিজেদের ন্যক্কারজনক কাহিনী শুনে একটু সামলাও তাতে তো আমারও কোন ক্ষতি নেই।

আরম্ভ করি তাহলে—?

১৮ই আগস্ট, ১৯৬৬।

বেলা দশটা আন্দাজ সময়। আমার বুকের উপর শুইয়ে দেওয়া হল একটি তরুণীকে। বয়স পঁচিশ বছরের মধ্যেই। আবেদনময় দেহের অধিকারিণী এই তরুণীর মৃত্যু খুব বেশিক্ষণ হয়নি; অভিজ্ঞতার জোরে বুঝতে পারলাম।

পোস্টমর্টেম হয়ে গেল। সার্জেনদের কথাবার্তায় মাত্র দুটি জিনিস জানতে পারলাম।

মেয়েটির নাম নির্মলা আর তার পাকস্থলীতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

প্রকৃত ব্যাপার জানবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মেয়েটি আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে—না, তাকে আর্সেনিক প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে—আসল ঘটনা কি? সেদিন কিছুই বুঝতে পারলাম না। জানা গেল, পরের দিন। আরেকটি তরুণীকে পোস্টমর্টেম করা হল। নির্মলার মত এর বয়সও পঁচিশের মধ্যে। দেখতে শুনতে খারাপ নয়—নাম বিজয়া। বিজয়ার পেটেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে ডাঃ ধর বললেন, গত পরশুর আর এই মেয়েটিকে একই সঙ্গে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। এর জীবনীশক্তি বেশি থাকায় দুদিন পরে মারা গেল।

ডাঃ দত্ত সবিস্ময়ে বললেন, একই লোক দুজনকে খুন করেছে নাকি?

—হবে। এই দুটি খুনের নেপথ্যে বিচিত্র এক মানবিক বিকার আছে বলতে পারেন।

—ঘটনাটা আপনি জানেন না কি? বেশ আগ্রহ বোধ করছি। বলুন, শুনি।

ইন্সপেক্টার কুলকার্নির মুখে কিছুক্ষণ আগে সমস্ত কিছু শুনলাম। বিজয়া মারা যাবার আগে কিছু কথা বলে যেতে পেরেছিল, রহস্য তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমি উৎকর্ণ হলাম।

ডাঃ ধর যা বললেন, তার সারমর্ম হল—

নির্মলা এক ক্লিনিকে কাজ করে। ক্লিনিক থেকে কাজ শেষ করে সেদিন বাসে করে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পেটের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় সে অজ্ঞানের মত হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে সেই বাসেই তার একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে আসেন। নির্মলার ব্যাকুল মা-বাবা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেন। ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করেও আসল গলদ ধরতে পারেন না। তাঁর ধারণা হয়, হজমের প্রচণ্ড রকমের গোলমালের দরুনই এরকমটা হয়েছে। তিনি সেইভাবে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে বিদায় নেন।

বাড়ি ফিরে নির্মলা একটা কথাও বলতে পারেনি। আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। রাত দশটার পর তার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটল। বাড়ির লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে হাসপাতালে পেঁছাল এগারটার কিছু পরে। ডাক্তাররা বুঝলেন জীবনের আশা কম। মুখে সন্দেহজনক সমস্ত লক্ষণ প্রকট

হয়ে উঠেছে। তবু তাঁরা হাল ছাড়লেন না। পাকস্থলী পাম্প করে আর্সেনিক মেশান কিছু খাদ্য বার করা সম্ভব হল। অন্যান্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও শেষরক্ষা করা গেল না। রাত তিনটার সময় মারা গেল নির্মলা।

নির্মলাকে নিয়ে যখন চিকিৎসকরা হিমসিম খাচ্ছেন, তখন বিজয়াকে আনা হয়েছে হাসপাতালে। তার অবস্থাও অতি শোচনীয়। জীবনের আশা কম। বিজয়া নির্মলার সঙ্গে একই ক্লিনিকে কাজ করে। সে-ও কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভোরবেলা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলেন। একই ধরনের দুটি কেস হওয়ায় তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, মেয়ে দু'টিকে আর্সেনিক প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইন্সপেক্টার কুলকার্নি তদন্ত করতে এলেন। নির্মলার দেহ পোস্টমর্টেমে পাঠান হল। পুলিশ দ্রুত কাজে নামল। ডেকে পাঠান হল নির্মলা ও বিজয়ার মা-বাবাকে। অনেক প্রশ্ন করা হল তাঁদের। কিন্তু এমন কোন কথা জানা গেল না যাতে এই সন্দেহজনক পরিস্থিতির উপর যবনিকাপাত হয়। তবে এটুকু জানা গেল, ওরা দুজনেই কাজ করত, "ইন্টারন্যাশানাল ক্লিনিকে"। ভাল মাইনে পেত। ঐ ক্লিনিকের কাজ হল বন্ধ্যা নারীদের সন্তানের জননী হওয়ার উপযোগী করে তোলা।

কুলকার্নি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ঐ ক্লিনিকের মধ্যেই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি নেই তো? যতদূর সম্ভব ক্লিনিকটির সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হল। সন্দেহের অবকাশ নেই সেখানে। শহরের উঁচুমহলে বিশেষ সুনাম আছে "ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লিনিকের"। অনেকেই এখানে চিকিৎসা করিয়ে সুফল পেয়েছেন।

ক্লিনিকটি কোন যৌথ মালিকানায় পরিচালিত হয় না। এটির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হলেন রঞ্জিত মেহতা। তবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন তাঁর স্ত্রী ললিতা। কুলকার্নি ভেবে দেখলেন, আপাতদৃষ্টিতে ওখানে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না। "ইন্টারন্যাশনাল ক্লিনিক" শহরের কেন্দ্রস্থলে নয়, শহরতলী ঘেঁষে। কুলকার্নি ওখানে গিয়ে দেখলেন বেশ ছিমছাম বাড়িটি। কলিং বেল পুশ করতেই বেয়ারার দেখা পাওয়া গেল। প্রশ্ন করে জানা গেল, মিঃ মেহতা বাড়িতে নেই। মেমসাহেব আছেন। তাঁকেই খবর দিতে বললেন ইন্সপেক্টার। বেয়ারা তাঁকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর মেম-সাহেবকে খবর দিতে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ললিতা মেহতা এলেন। তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কুলকার্নি। একাঙ্গে এত রূপ! এমন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা জীবনে তিনি আর দেখেননি। সাজ-পোশাকও চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মত। মনে হয় তিনি কোথাও বেড়াতে যাবার জন্যই বোধহয় প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

নমস্কার জানিয়ে কুলকার্নি বললেন, মিঃ মেহতার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছিলাম। শুনলাম তিনি নেই। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হল।

ললিতা বললেন, উনি শহরের বাইরে গেছেন। কাল সকালে ফেরার কথা। আপনার কথা তাড়াতাড়ি শেষ করুন, আমার বিশেষ তাড়া আছে।

—নির্মলা ও বিজয়া নামে দুটি মেয়ে আপনাদের ক্লিনিকে কাজ করে ?

—হ্যাঁ, করে। কেন বলুন তো ?

—নির্মলা মারা গেছে।

—তাই নাকি! খুবই দুঃখের কথা। কি হয়েছিল তার ?

আমরা সন্দেহ করেছি তাকে খুন করা হয়েছে। বিজয়ারও শেষ অবস্থা। তার পেটেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

ললিতা মেহতার মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, খুন করা হয়েছে ? তাদের কে খুন করতে যাবে ? তদন্ত করে দেখুন, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে দুজনেই আত্মহত্যা করার জন্য আর্সেনিক খেয়েছিল।

ইন্সপেক্টার বললেন, আমরা অবশ্যই অনুসন্ধান করব। ওদের সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

—করুন। তবে আমার সময় বিশেষ……

সময়ের মূল্য আমরা বুঝি। খুব বেশিক্ষণ আপনাকে আটকাব না। আচ্ছা ঐ মেয়ে দুটি ক্লিনিকে কি কাজ করত ?

—সত্যি কথা বলতে কি, কোন কাজই ওদের দ্বারা হত না। চাকরির জন্য এসে কেঁদে পড়েছিল তাই রেখেছিলাম।

—ওরা যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করত সেখানে কি আর্সেনিক ছিল ?

—আর্সেনিক! খিল খিল করে হেসে উঠলেন ললিতা। বন্ধ্যানারীদের সন্তানবতী করে তোলা যে ক্লিনিকের উদ্দেশ্য, সেখানে আর্সেনিক থাকবে কেন ? আপনার নিশ্চয় আর কোন প্রশ্ন নেই ?

—আছে। মেয়ে দুটির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন ?

—চরিত্র ওদের গঙ্গাজলের মত, একথা ভাবাই হাস্যকর। উঠতি বয়সের মেয়েরা নিজেদের মেলে ধরতেই তো চায়। তবে কতজন বয়ফ্রেণ্ড তাদের ছিল, তার হিসেব অবশ্য আপনাকে দিতে পারব না।

ধন্যবাদ। এখন আমি চলি। আপনার স্বামী ফিরে এলেই তাঁকে বলবেন টাউন থানায় গিয়ে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।

কুলকার্নি বিদায় দিলেন।

এদিকে একজন সাব-ইন্সপেক্টারকে বিজয়ার বেডের পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। যদি তার জ্ঞান ফিরে আসে, যদি এমন কিছু কথা বলে, যা তদন্তের

পক্ষে কাজে লাগে, তাই এই ব্যবস্থা। কুলকার্নি যখন মেহতাদের বাড়ি গেছেন, সেই সময় সামান্য চেতনা ফিরে এল বিজয়ার। চিকিৎসকরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাব-ইন্সপেক্টার ঝুঁকে পড়ল তার মুখের উপর।

—কেমন বোধ করছেন এখন ?

ক্ষীণ গলায় বিজয়া বলল, ভীষণ কষ্ট !

—হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিভাবে ?

—মিষ্টি খেয়েছিলাম। তারপরই…

—কোথায় মিষ্টি খেয়েছিলেন ?

—ক্লিনিকে।

বিজয়া আর কথা বলতে পারল না। আবার জ্ঞান হারাল।

সে মারা গেল আরো ঘণ্টা চারেক পরে অজ্ঞান অবস্থায়। কুলকার্নি ইতিমধ্যে বিজয়া কি বলেছে শুনেছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, ঐ আর্সেনিক মেশান মিষ্টি খেয়ে নির্মলাও মারা গেছে।

ডাঃ ধর তো নিজের গল্প শেষ করলেন। এদিকে আমার মন আগ্রহের শেষসীমায় এখন। নির্মলা ও বিজয়াকে কে খুন করল না জানা পর্যন্ত এই আগ্রহের উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়বে না। তাছাড়া একটা নয় এই জোড়াখুনের উদ্দেশ্য কি তাও জানা দরকার। কে জানাবে আমায় ? এরা যদি আবার এখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলে এই সম্পর্কে, তবেই জানতে পারব। আমি অনড়, মূক, লাশকাটা টেবিল ; আমার নিজের তো কোন ক্ষমতা নেই !

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কয়েকদিন পরের কথা ; একটি বৃদ্ধ বাসচাপা পড়েছিল। তার কাটা-ছেঁড়া শেষ হয়েছে সবেমাত্র। দস্তানা খুলতে খুলতে ডাঃ ধর বললেন, শুনেছেন তো খুনী ধরা পড়েছে ?

—কোন খুনী ? ডাঃ দত্ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

—ক'দিন আগে দু'টি মেয়েকে আর্সেনিক প্রয়োগ করে মারা হয়েছিল না ? তাদের খুনীর কথা বলছি।

—ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। বলেন কি ? কিভাবে ধরা পড়ল ?

—পুলিশ এ ব্যাপারে খুব তৎপরতা দেখিয়েছে। আমি তো ইন্সপেক্টার কুলকার্নি'র মুখে শুনলাম সমস্ত।

—বলুন না, আমিও শুনি।

আমি সাগ্রহে কান পেতে রইলাম।

ডাঃ ধর আরম্ভ করলেন ঃ

বিজয়ার স্টেটমেণ্ট পাবার পর পুলিশ আবার পেঁছাল ইণ্টারন্যাশনাল ক্লিনিক-এ। মেহতাদের বাড়ি তো ক্লিনিক সংলগ্নই। মিসেসকে বাড়িতে

পাওয়া গেল না। চাকরের মুখ থেকে জানা গেল, তিনি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকে গেছেন। তবে গৃহকর্তা কিছুক্ষণ হল ফিরেছেন। মালপত্র রেখেই তিনি অবশ্য বেরিয়ে গেছেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবেন।

কুলকার্নি ড্রয়িংরুমেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিঃ মেহতা ফিরলেন প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে তাঁর। গোলগাল বেঁটে-খাটো চেহারা। মুখও ধারাল নয়, কেমন গোবেচারা ভাব। এই রকম একটি পুরুষ ললিতা দেবীর মত নারীর স্বামী ভাবাই যায় না।

কুলকার্নি নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এই সম্পর্কে কথা বলে গেছেন তাও জানালেন। মিঃ মেহতা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এ সমস্ত যেন বিশ্বাস করতে তাঁর মন চাইছে না।

তিনি অসংলগ্ন গলায় বললেন, এত কাণ্ড হয়ে গেছে এই দুদিনে! আমি তো···আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—মেয়ে দুটির সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল ?

—চিনতাম। আমার ক্লিনিকে কাজ করত, অথচ আমি চিনতাম না তা তো হতে পারে না। বড় ভাল মেয়ে ছিল ওরা।

—আপনার স্ত্রীর মতে কিন্তু মেয়ে দুটি ভাল ছিল না।

—তার কথা বাদ দিন। সে তো সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখে. অবিশ্বাস করে।—বেশ সহজভাবেই মিঃ মেহতা বললেন, তার এ ধারণাও আছে, ক্লিনিকের মেয়েদের সঙ্গে আমি অসঙ্গতভাবে মেলামেশা করি।

- শুনলাম আপনার স্ত্রী ক্লিনিক চালান—এর অর্থ কি ?

—আমার চেয়ে সে করিতকর্মা। তাছাড়া ওসমস্ত কিছু আমি বুঝি না। তার ইচ্ছাতেই এই ক্লিনিক করা।

—এই হত্যা দুটির ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন ?

—সন্দেহ ? মাথামুণ্ডু ও নিয়ে আমি কিছু ভাবিইনি। তবে···অ্যাঁ, আপনি আবার আমাকে সন্দেহ করে বসছেন না তো ?

দৃঢ়গলায় কুলকার্নি বললেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে সন্দেহ করতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই ধারার বাইরে আপনাকে ফেলা চলে না। তাছাড়া বিজয়া মারা যাবার আগে যা বলে গেছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে, এখান থেকে সরবরাহ করা আর্সেনিক মেশান মিষ্টি ওরা দুজনে খেয়েছিল। সত্যি কথা না বললে আইন আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

মিঃ মেহতা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, বিলিভ মি,

ইন্সপেক্টার, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমার স্ত্রীর দায় আমার ঘাড়ে চাপাবেন না।

—আপনি বলতে চান আপনার স্ত্রী···

—আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে চাই না। আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় সন্দেহপরায়ণা নারীরা সবই করতে পারে।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কুলকার্নির তীক্ষ্ণ জেরার মুখে দাঁড়াতে পারলেন না মেহতা। তিনি এমন অনেক কথা বলে ফেললেন যাতে হত্যাকারী চোখের সামনে আকার নিতে আরম্ভ করল। জানা গেল, ললিতা দেবী নিজে স্বেচ্ছাচারিতা করলেও স্বামীকে রাখেন কড়া শাসনে। কোন সুন্দরী মেয়ের দিকে স্বামী একটু তাকিয়ে থাকলেই জ্বলে ওঠেন। বিজয়া ও নির্মলাকে কাজে বহাল করেছিলেন মিঃ মেহতা। তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। এ নিয়ে প্রচুর অশান্তি হয়েছে সংসারে। ইদানিং মেহতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রয়োজনবোধে মেয়ে দুটির সঙ্গে হেসে কথা বলবেন। কুন্তি নামে ললিতা দেবীর একটি অতিবাধ্য পরিচারিকা আছে। তার হাত দিয়ে তিনি আর্সেনিক আনিয়েছিলেন মেহতা লক্ষ্য করেছেন। কেন আনানো হয়েছে এবং এর জন্য কোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন দরকার হয়েছিল কিনা, তা তিনি জানেন না। আগ্রহ তাঁর কম ইত্যাদি।

কুন্তিকে তখনই ডাকা হল। পুলিশ দেখে সে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ ভয় দেখাতে হল না। অনেক কথা বলল সে। একথাও বলল, তার কিনে আনা ওষুধ দিয়ে মিষ্টি নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন মালকিনী। আর্সেনিক সংগ্রহের ব্যাপারে যে ডাক্তারটির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছিল তার নামও জানা গেল।

পুলিশ অপেক্ষা করে রইল। রাত ন'টার পর ললিতা দেবী বাড়ি ফিরতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। প্রথমে তিনি কিছুই স্বীকার করবেন না। জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন, হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাজ করে ফেলেছেন।

······দেখছো তো তোমরা, কিভাবে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলো। সামান্য হিংসার দরুন দুটি জীবন নষ্ট হয়ে গেল! নাঃ, তোমরা উপদেশ পাবারও যোগ্য নও। আমি লাশকাটা টেবিল না হয়ে যদি তোমাদের মত চলতে-ফিরতে পারতাম—আমার মনেও কি এই সব বিকার উদয় হত? আমিও কি তোমাদের মত উম্মাদ হয়ে উঠতাম? কে জানে!

● ● ●

আবার এসেছো আজ?

অনেক দিন পরে এলে। অনেক কাহিনী জমা হয়ে রয়েছে। তবে কেন

জানি না তোমাদের কিছু বলতে আগেকার মত আর উৎসাহ বোধ করছি না। বোধহয় মানসিক অবসাদ আমায় পেয়ে বসেছে। ডোমেরা ঠিকই বলাবলি করে —আমার বাতিল হবার দিন এসে গেছে।

তবে তোমরা যখন এসে পড়েছো তখন তোমাদের একটা কাহিনী শোনাব। আমার জীবনের শেষ কাহিনী। শেষবারের মত বলছি বলেই কাহিনী দীর্ঘ। এদেশের শ্রেষ্ঠতম বেসরকারী গোয়েন্দা বাসবের নাম তোমরা সকলে শুনেছো। এমন কি অনেকে চাক্ষুষ দেখেও থাকবে। আমার এই কাহিনীটির সঙ্গেই ওই গোয়েন্দাপ্রবর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, আজ পর্যন্ত যত কাহিনী বলেছি তার অধিকাংশের কেন্দ্রবিন্দু একটি নারীর মৃত্যু। এবারও একটি তরুণীর থেঁতলানো মৃতদেহ এল পোস্টমর্টেমের জন্য। তারিখটা মনে আছে পরিষ্কার—৬ই মার্চ, ১৯৯৬। শুনলাম, মেয়েটিকে নাকি তেতলার জানলা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে তার স্বামীকেই।

বেশ কিছুদিন পরে এই হত্যার নেপথ্যকাহিনীটা আমি শুনলাম। ডাঃ গুহ ঠিক যেভাবে নিজের সহযোগীদের শোনালেন, আমি সেইভাবেই তোমাদের বলছি। বিচিত্র এই কাহিনী।

সুস্নাত কোনরকমে রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ার মধ্যে। লোকে লোকারণ্য আদালতগৃহে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। অথচ একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সকলেই উৎসুক।

কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পূর্বেই।

পাব্লিক প্রসিকিউটর রণদাকান্ত চৌধুরী তখন নাটকীয়ভাবে বলে চলেছেন। সকলের দৃষ্টি তাঁরই উপর নিবদ্ধ। নিশ্চুপ আদালতগৃহে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

তিনি বলছেন, ইওর অনার, এবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই যে, আসামী সুস্নাত চৌধুরী সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ও পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে নিজের স্ত্রী অপর্ণা চৌধুরীকে হত্যা করেছে। সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি এবং ৩০২ ধারা অনুসারে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে। এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—

কিন্তু কথা তাঁর শেষ হল না। আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবী নির্মল পালিত তীব্রগলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন, আই অবজেক্ট, ইওর অনার। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত না করেই মিঃ চৌধুরী আমার মক্কেলের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি করে নিশ্চিতভাবে সুবিবেচনার পরিচয় দিচ্ছেন না।

প্রবীণ বিচারপতি হাতের ইঙ্গিত করে নির্মল পালিতকে বসতে ইঙ্গিত করে রণদাকান্তব দিকে তাকিয়ে, গম্ভীর গলায় বললেন, প্রসিড—

হাসিতে সম্পূর্ণ মুখখানা ভাসিয়ে পাব্লিক প্রসিকিউটব আবার আবম্ভ করলেন, পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায়, প্রায় রাত বারটার সময় অসুস্থা অপর্ণা চৌধুরীকে তেতলার ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। সে সময় ওই ঘরে স্বাভাবিকভাবে একমাত্র তাঁর স্বামী অর্থাৎ আসামীই উপস্থিত ছিল। অবশ্য পুলিশ গিয়ে দেখতে পায় আসামী তখন নীচে মৃতদেহের পাশে মুহ্যমানেব মত বসে রয়েছে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিলেন তিনি। এক ঢোক জল খেয়ে, নির্মল পালিতের দিকে তির্যকদৃষ্টি হেনে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, আমার মাননীয় তরুণ বন্ধু সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বলছিলেন এবং আসামীকে তিনি নিবপরাধ হিসেবে দাবী করেছেন। এটা কত বড মিথ্যা তা এইবার আমি প্রমাণ করব। ইওর অনার, এই সূত্রে আমি নিজের সাক্ষীদের তলব করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

বিচারপতি মাথা হেলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

পাব্লিক প্রসিকিউটর চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, এবার মূল কাজ আরম্ভ হচ্ছে। আমার প্রথম সাক্ষী হলেন মৃতা মিসেস চৌধুরীর সহোদর ভ্রাতা অশোক রক্ষিত। মিনিটখানেকের মধ্যে সাক্ষ্যমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন অশোক রক্ষিত। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে। বেশ উঁচু এবং চওডা চেহারা। গায়ের রং কালোই বলা চলে। মুখের গড়ন চলনসই। মাথার চুল কিছু পাতলা হয়ে এসেছে।

তাঁকে অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

বোনের আকস্মিক মর্মন্তুদ মৃত্যুতে বেশ শোকাহত বোধহয়। তিনি 'গীতা' ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পর রণদাকান্ত চৌধুরী এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

—ওয়েল মিস্টার রক্ষিত, মৃতা মিসেস চৌধুরী আপনার বোন ছিলেন ?

—হ্যাঁ। সহোদর বোন।

—আসামী আপনার ভগ্নীপতি। লোক হিসেবে সে কেমন ?

সুস্নাতর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভারী গলায় অশোক রক্ষিত বললেন, ওকে ভাল লোক বলেই জানতাম।

—হত্যাকাণ্ডের দিন রাত্রে আপনি ওই বাড়িতেই ছিলেন কি ?

—হ্যাঁ। ওটা আমাদের নিজস্ব বাড়ি।

—আপনাদের বাড়িতে আপনার বোন ছিলেন কেন ? তাঁর তো নিজের শ্বশুরবাড়িতে থাকবার কথা ?

—তাই ছিল। ওখানে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে আমরা নিয়ে এসেছিলাম।

—নিয়ে এসেছিলেন কেন? ওখানে কি ভালভাবে চিকিৎসা হচ্ছিল না?

—না।

রণদাকান্ত চৌধুরী থামলেন এক মিনিট।

নিজের কোটের বোতাম খুললেন, আবার লাগালেন।

—মিসেস্ চৌধুরী যেদিন নিহত হন, সেদিনের সমস্ত কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে?

—সেদিনের কথা ভোলা যায় না।

—ঘটনাটা আমাদের বলবেন কি?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন অশোক রক্ষিত। মনে হল সেদিনের সমস্ত ঘটনাটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিলেন।

বললেন তারপর, সেদিন অপর্ণার শরীর অন্যান্য দিনের চেয়ে ভাল ছিল। আমি যখন ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি তখন রাত সাতে আটটা। খাওয়া দাওয়া সেরে আমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতে। তাড়াতাড়ি নীচে এসে দেখি অপর্ণা রক্তাক্ত শরীরে উঠানে লনের ধারে পড়ে রয়েছে। তার শরীরে তখন প্রাণ নেই। বাড়ির অন্যান্য সকলে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

—আপনি যখন আপনার কোণের ঘর থেকে চলে আসেন তখন আসামী কোথায় ছিল?

—বলতে পারব না।

—প্রত্যহ রাত্রে সে কোথায় থাকত?

—আমার বোনের ঘরে। কাজেই খুব সহজেই সে তাকে জানলা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পেরেছিল।

রণদাকান্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিলেন।

—অকারণে কেউ নিজের স্ত্রীকে খুন করে না। খুনের উদ্দেশ্য কি বলতে পারেন?

একটু ইতস্ততঃ করে অশোক রক্ষিত বললেন, আমাদের এই পারিবারিক খবর কাগজের দৌলতে অবশ্যই কারুর অজানা নেই। আপনিও জানেন কারণটা কি? আমি বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

—আপনি মিথ্যে সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন মিঃ রক্ষিত। প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করার মধ্যে কুণ্ঠার কোন স্থান নেই। আপনি বলুন।

একটু থেমে অশোক রক্ষিত বললেন, আমার পিসতুতো বোন সুদীপার সঙ্গে শুভ্রাতর ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘদিনের। অপর্ণার সঙ্গে বিয়ের পরও ওদের

অন্তরঙ্গতা অব্যাহত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই অপর্ণা এ ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেনি। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত। সুস্নাত তাকে বারংবার অপমানিত করেছে এবং—

ঝলসে উঠলেন রণদাকান্ত।

—হিয়ার ইজ দি মেন পয়েণ্ট ইওর অনার, নিজের পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করবার জন্য অর্থাৎ সুদীপা দেবীকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য আসামী সুস্নাত চৌধুরী নিজের গুরুতর মানসিক রোগাক্রান্তা স্ত্রীকে উপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে অপর্ণা দেবী নিজেই পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। কিন্তু বাড়ির লোকেদের সতর্কতার জন্য আসামীর সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি।

ধন্যবাদ অশোকবাবু, আপনাকে আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই।

অশোক রক্ষিত সাক্ষ্য-মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার পর দ্বিতীয় সাক্ষী গৌর বসাককে আহ্বান করা হল। গৌর বসাক এসে দাঁড়ালেন। মাঝামাঝি উচ্চতা তাঁর। সুন্দর মুখের অধিকারী তিনি। আদালতের আনুষ্ঠানিক কাজগুলি শেষ হবার পর মিঃ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, গৌরবাবু, আপনি তো রক্ষিতদের পারিবারিক বন্ধু, তাই না ?

—দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

—আসামীকে নিশ্চয়ই চেনেন ?

—বিলক্ষণ। ওর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতাই আছে।

—তার মত ভদ্রযুবক এরকম কাজ করতে পারে আপনি কোনদিন ভেবেছিলেন ?

—না। শান্ত, সংযত ও রুচিবান বলেই ওকে জানতাম।

—ওয়েল মিঃ বসাক, আপনি একথাও নিশ্চয়ই জানতেন বিবাহিত হয়েও সুস্নাত চৌধুরী অসঙ্গতভাবে সুদীপা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল ?

গৌর বসাক উত্তর দেবার আগেই নির্মল পালিত উঠে দাঁড়ালেন।

তীব্রগলায় বললেন, আই অবজেক্ট ইওর অনার। অসঙ্গত কথাটা এখানে ব্যবহার করা মোটেই সঙ্গত হচ্ছে না।

বিচারপতি সংযত ভাষায় প্রশ্ন করতে রণদাকান্ত চৌধুরীকে নির্দেশ দিলেন। আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল।

—আপনি জানতেন আসামী সুদীপা দেবীকে ভালবাসে ?

—একথা কে না জানে, আমিও জানতাম।

—অন্যের সঙ্গে ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আসামী অপর্ণা দেবীকে বিয়ে করেছিল কেন বলতে পারেন ?

গৌর বসাক সুস্নাতর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অসঙ্কোচে বললেন, মানে ··এবিষয়ে আমার কিছু বলাটা···

—কিছুমাত্র অন্যায় হবে না মিঃ বসাক। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

—সুস্নাতবাবু অপর্ণাকে বিয়ে করেছিলেন তার বাপের টাকা দেখে। আন্তরিকতাকে মূল্য দেওয়ার প্রশ্ন এখানে ওঠেনি।

—আপনি কি কোনদিন আসামীর কোন সন্দেহজনক কথাবার্তা বা ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন ?

—ইদানীং অবশ্য খুবই তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হত। একদিন···

—একদিন কি বলুন।

—একদিন আমায় বলেছিলেন, আর পারা যায় না। এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। এই কথার দুদিন পরেই অপর্ণা নিহত হল।

—অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ বসাক। এবার আপনি যেতে পারেন।

এরপর সুস্নাতর শ্বশুর বিনয় রক্ষিত ও তাঁর ম্যানেজার হরিশঙ্কর সেনকে ডাকা হল। জেরার মুখে তাঁরা যা বললেন তার সারমর্ম হল, জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না। প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকত। ইদানীং অপর্ণা রোগগ্রস্তা হয়ে পড়ার পর ওদের সম্পর্ক আরো খারাপ হয়ে পড়েছিল। সুদীপাকে নিয়েই যে এই স্থায়ী মনোমালিন্য সে সম্পর্কে তাঁরা জোর দিয়ে কিছু বলতে চান না। তবে এবিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই যে, সুস্নাত উপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে অপর্ণাকে হত্যা করেছে। শিক্ষিত মানুষ যে পশু হয়ে যেতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সে।

তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করার পরই আদালতের সময় শেষ হয়ে এসেছিল। কাজেই পরের দিনের জন্য কেসটি মুলতবী রেখে মাননীয় বিচারপতি আসন ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

নির্মল পালিত নিজের চেম্বারে বসে গভীর চিন্তামগ্ন।

ঘরে আর কেউ নেই। চিন্তার সমুদ্রে তিনি একাই হাবুডুবু খাচেহন। কপালে অজস্র কুঞ্চন-রেখা দেখা দিয়েছে। মিনিটের পর মিনিট ধরে তিনি আজকের কেসটির বিষয় চিন্তা করে চলেছেন।

একসময় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন নির্মল পালিত।

ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মন্থর পায়ে পায়চারি আরম্ভ করলেন। ওই সঙ্গে আজকের আদালতের সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলো সরীসৃপের মত মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যেতে লাগল।

সাক্ষ্য-প্রমাণ সমস্তই সুস্নাতর বিপক্ষে গেছে। সে যে হত্যাকারী, অবধারিতভাবে বিচারপতির মনে বদ্ধমূল হবে। ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস! ব্যক্তিগতভাবে নির্মল পালিত তাঁর মক্কেল সুস্নাত চৌধুরীকে ভালভাবেই জানেন। দুজনের বন্ধুত্ব আজ থেকে নয়। সে আর যাই করুক অন্ততঃ মানুষ খুন করতে পারে না। সুদীপাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও অবস্থা বিপাকে অপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, মনে মনে সে এ বিয়েকে মেনে নেয়নি। তাঁর কাছে সে কতবার আক্ষেপ করে গেছে। ঘোর অশান্তিময় ছিল তার দাম্পত্য জীবন—তবু এইরকম একটা নির্মম হত্যা তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনমতেই।

নির্মল পালিত এক সময় থমকে দাঁড়ান দক্ষিণদিকের জানলাটার সামনে এসে। ব্রিফ ঘেঁটে ও মাথা খাটিয়ে এমন কতকগুলি পয়েণ্ট তাঁকে বার করতে হবে যাতে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় সুস্নাতকে।

অতীতের কত কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। সুস্নাতর মুখেই শুনেছেন তার জীবনের বিচিত্র দিনগুলির কথা। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে তিনি যেন পরিষ্কার সেই সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক বলা হল না, ছায়াছবির মত তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠছে সুস্নাতর জীবনের অনেক কাহিনী। সেদিন—

ইডেন গার্ডেনের বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা বেঞ্চের উপর অস্থির চিত্তে বসে রয়েছে সুস্নাত। মাঝে মাঝে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছে, আর দৃষ্টি প্রসারিত করছে এসপ্লানেডের দিকে চলে যাওয়া কালো পিচের রাস্তাটার উপর। প্রায় ছ'টা বাজে। এখ ও সুদীপার দেখা নেই। এরকম দেরী তো বড় একটা হয় না তার।

ঘড়ির কাঁটা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। আর মিনিট দশেক দেখে উঠে পড়বে সুস্নাত। কিন্তু উঠে যেতে আর হল না। কারণ এই সময় সুদীপাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সুস্নাত বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কাছাকাছি হতেই সুদীপা বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না?

—তোমার আসবার কথা ছিল পাঁচটার সময়। এখন ঘড়িতে ক'টা বেজেছে চেয়ে দেখ।

—লক্ষ্মীটি রাগ করোনা। আমি ইচ্ছে করে দেরী করিনি। অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ অপর্ণা এসে উপস্থিত। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। দুজনে জলের ধারে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

সুদীপা একটু ঘন হয়ে বসল সুস্নাতর কাছে।

—অপর্ণা না এসে পড়লে আমি তোমার আগেই এখানে এসে উপস্থিত হতাম।

—কিন্তু অর্পণাটি কে তা তো বলছ না।

—আমার মামাত বোন। বিখ্যাত ধনী বিনয় রক্ষিতের মেয়ে।

—ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছিলাম বটে, আয়রন কিং বিনয় রক্ষিত তোমার মামা। যাক, ওকথা। আজ আমি তোমায় এখানে কেন ডেকেছি বলতো?

মৃদু হেসে সুদীপা বলল, কিছু কিছু আন্দাজ করছি। তবে কথাটা তুমি বললেই ভাল হয় না কি?

সুস্নাতও হাসল।

—তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারনি?

—করেছি মশাই, করেছি। তুমি মনে কর তোমারই যত তাড়া, আমার যেন তাড়া নেই!

—আছে নাকি! বলনি কেন এতদিন?

—খালি দুষ্টুমি। বলবে কিছু?

সুস্নাত ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এবার আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।

প্রথমে কিছু বলল না সুদীপা। সুস্নাতর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল একটু পরে, তুমি তো জান, মা এ ব্যাপারে আপত্তি তুলবেন না।

—আর তুমি?

—আমার ভীষণ আপত্তি আছে।

স্থান কাল ভুলে গলা ফাটিয়ে হাসল সুস্নাত।

—তোমার আপত্তি গ্রাহ্য করছে কে?

—আমার আপত্তি না হয় গ্রাহ্য করলে না। কিন্তু তোমার বাবার তো একটা মতামত আছে। তিনি যদি আপত্তি করেন?

—আমি তাঁকে জানি যে! কখনই আপত্তি করবেন না। অবশ্য আজ রাত্রেই কথাটা আমি পাড়ব।

এরপর দুজনের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হল। প্রায় ন'টার সময় দুজনে উঠল ওখান থেকে। সুদীপাকে এলগিন রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে সুস্নাত ট্যাক্সিতেই সোজা বাড়ি ফিরে এল। তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এরই মধ্যে বাড়ি নিস্তব্ধতায় ছম্ ছম্ করছে।

পিতা-পুত্রের ছোট্ট সংসার। মা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। ভাল করে তাঁকে মনেও পড়ে না সুস্নাতর। স্ত্রী গত হবার পর অবশ্য সুশান্তবাবু আর বিয়ে করেননি। অসীম স্নেহে পুত্রকে মানুষ করার ব্রতে ব্রতী থেকেছেন।

সুস্নাত মন্থর পায়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ট্রাউজার ও সার্ট বদলে পাজামা ও গেঞ্জি পরে বিছানায় এলিয়ে দিল গা। আজ আর কিছু বাবাকে বলা যাবে না। তিনি অভ্যাস মত এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল সকালে সমস্ত কিছু বললেই চলবে।

মিনিট কয়েক পড়ে রইল বিছানায় চোখ বন্ধ করে। সুদীপার কথা মনে পড়ছে। ওর চিন্তা থেকে এক মুহূর্তও যেন দূরে থাকতে পারে না। কলেজে ক্লাশ করতে করতে কোন ছাত্রীর দিকে দৃষ্টি পড়লেই মনে হয় সুদীপা বসে আছে। শুনছে মন দিয়ে তার লেকচার।

ক্লান্তি দূর হবার পর সুস্নাত উঠল।

সে প্রায়ই রাত্রে দেরী করে ফেরে বলে তার খাবার চাকর খাবার-ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখে টেবিলের উপর। অনেকদিনের পুরনো চাকরের এজন্য অনুযোগের সীমা নেই। কিন্তু সুস্নাত তার কথায় কান দেয় না।

বারান্দায় এসে খাবার-ঘরের দিকে যেতে যেতে তার নজর পড়ল বাবার ঘরের দিকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ফিকে আলোর রেশ এধারের দেওয়ালে ম্লানভাবে পড়েছে। তবে কি এখনও বাবা ঘুমাননি! পায়ে পায়ে সুস্নাত সুশান্তবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ারের উপর মুহ্যমানের মত বসে আছেন সুশান্তবাবু। তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। সুস্নাতর বুঝতে বিলম্ব হল না, একটা অঘটন নিশ্চয় ঘটেছে। তিনি তো ওভাবে বসে থাকবার লোক নন!

—বাবা—

—কে—? শান্ত···এদিকে আয় বাবা।

—কি হয়েছে বাবা? তুমি এভাবে বসে রয়েছো যে!

—বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল সুশান্তবাবুর।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে শান্ত! আজ অফিসের কুড়ি হাজার টাকা আমার কাছ থেকে খোয়া গেছে।

—খোয়া গেছে!!

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কিভাবে এরকম হল?

—আমি ওরিয়েণ্ট স্পিনিং মিল থেকে কুড়ি হাজার টাকার ক্যালেকশন্ নিয়ে ফিরছিলাম অফিসে, পথেই—

—পুলিশকে ইন্‌ফর্ম করেছো নিশ্চয়ই?

পুলিশ! তুই বলছিস কি? এতদিনের মান-সম্মান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে আমি পুলিশের কাছে যাব?

বিস্মিত হয়ে সুস্নাত বলল, তার মানে তুমি এখনও অফিসে একথা জানাওনি !

—না। এখনও জানাইনি।

—কেন বাবা ?

—একটা সঙ্কোচ আমাকে মূক করে রেখেছে শান্ত।—সুশান্তবাবুর গলায় কাতরতা ফুটে উঠল।—বিশ বছরের সততায় আমি লোকের মনে সম্মানের আসন পেতে বসে আছি। তাকে এককথায় ভুলুণ্ঠিত করতে মন সায় দিল না কিছুতেই।

—কিন্তু তুমি তো কোন দোষ করনি। তাছাড়া ক'দিন ব্যাপারটাকে চেপে রাখতে পারবে ? মাসের শেষে ক্যাশ ক্লিয়ারেন্সের সময় ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

—প্রকৃত কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। আমি চোর প্রতিপন্ন হয়ে যাব। উঃ ! এ আমার কি হল। শেষ বয়সে একি অপবাদের মুখোমুখি দাঁড়ালাম ? এত মোটা অঙ্কের টাকা শোধ দেবার সাধ্য আমার নেই। সুইসাইড করা ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

সুস্নাত আর্ত গলায় বলল, বাবা—

—ইয়েস মাই বয়, দিস্ ইজ দি ওনলি ওয়ে। আমি তোকে আপ্রাণ চেষ্টায় মানুষ করেছি। জীবনে ভাল একটা পথ বেছে নেবার অবকাশ তোর হয়েছে।

সুশান্তবাবুর ব্যাথা মর্মে মর্মে অনুভব করল সুস্নাত। সমস্ত জীবন তিনি দায়িত্বশীল পদে সততার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। এই উদারচেতা ও জেদী মানুষটি জীবনে কারুর একটি পয়সাও এধার-ওধার করেননি। তাই আজ এতগুলো টাকা খোয়া যাবার পর সর্বাগ্রে নিজের সম্মান বাঁচানোর কথা মনে জেগেছে। তিনি যে টাকা আত্মসাৎ করেননি একথা হয়তো সকলেই বিশ্বাস করবে। তবে পুলিশের জেরা, হয়তো শেষ পর্যন্ত কোর্ট-কাছারী—একথা ভাবতেও সুশান্তবাবুর সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছে।

—বাবা এ থেকে বাঁচবার কি কোন উপায় নেই ?

—আছে। একটা উপায় আছে। তবে—

—কি উপায় ? বল—বল তুমি—

—কোম্পানীর ডিরেক্টাররা যদি একটা সুযোগ দেন। মাসে মাসে টাকাটা শোধ করে দেবার সুযোগ। তবে সে সুযোগ তাঁরা আমায় দেবেন না। সমস্ত কথা শোনার পরই পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেবেন আমায়।

দৃঢ়গলায় সুস্নাত বলল, কে কে আছেন ডিরেক্টার বোর্ডে ? দেখি আমি যদি কিছু করে উঠতে পারি।

—তুই—!!!

—হ্যাঁ বাবা। তোমার এই বিপদে আমারও কিছু করণীয় রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে তুমি একবার বলেছিলে তোমাদের ডিরেক্টার বোর্ডে বিনয় রক্ষিতও আছেন!

—তিনি ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান।

এরপর সুস্নাত সুশান্তবাবুর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে টাকা খোয়া যাওয়া সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জেনে নিল। তাঁকে বিশ্রাম করবার অনুরোধ জানিয়ে যখন ঘরে ফিরে এল তখন রাত দুটো বেজে গেছে।

ভোর হওয়ার পর সুস্নাতর প্রথম কাজ হল সুদীপার সঙ্গে দেখা করা। দেখা হল। প্রথম দর্শনেই ওর চেহারার শোচনীয়তা লক্ষ্য করল সুদীপা।

—একি! তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? রাত্রে ঘুমাওনি নাকি?

—না। ঘুমাবার অবকাশ আর পেলাম কোথায় দীপা। তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরই বাড়িতে বিরাট এক বিপর্যয় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

—বিপর্যয়! আমি তো—কি হয়েছে আমায় বল?

সুস্নাত সমস্ত কথা খুলে বলল।

সুদীপা স্তম্ভিত!

—তোমার মামার কাছে যাওয়া ছাড়া আমার এখন আর কোন পথ নেই।

—আমার মনে হয় মামাবাবু তোমার কথা রাখবেন। মানুষ হিসেবে তিনি খুব খাঁটি।

—তুমি ভরসা দিচ্ছ? ঘুরেই আসি তাহলে।

—নিশ্চয়ই ঘুরে আসবে। তুমি এখনই বরং তাঁর কাছে চলে যাও। এসময় তাঁকে বাড়িতেই পাবে।

সুস্নাত আর অপেক্ষা করল না।

সুদীপার কাছ থেকে মিঃ রক্ষিতের ঠিকানা নিয়ে রওনা হল সুস্নাত।

পার্লারে বসে বিনয় রক্ষিত কন্যা অপর্ণার সঙ্গে আলাপে রত ছিলেন। গতকাল কলেজের ফাংশনে এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাদের আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বয় এসে জানাল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—কার্ড দেখি?

—কার্ড দেননি—

—নাম জিজ্ঞেস করেছিলে তার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সুস্নাত চৌধুরী।

—সুস্নাত চৌধুরী ?—নিয়ে এস তাকে এখানে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুস্নাত পার্লারে এল।

বিনয় রক্ষিত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। এই দীর্ঘকায় স্বরূপ যুবকটিকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছেন বলে মনে হয় না।

অপর্ণার দৃষ্টিও বার কয়েক ওর উপর গিয়ে পড়ল।

বিনয় রক্ষিত নিজের বিস্মিত ভাবকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরিণত করলেন।

—আমার নাম সুস্নাত চৌধুরী। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

সুস্নাতকে বসতে ইঙ্গিত করে বিনয় রক্ষিত বললেন, বলুন ?

—কথাটা একটু গোপনীয়। মানে···

—আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমার মেয়ের সামনে আপনার সঙ্কোচ করবার কিছু নেই।

সুস্নাত মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করে নিয়ে আরম্ভ করল, আপনি আমায় চেনেন না। আমার আগমনে তাই একটু আশ্চর্য হচ্ছেন। আমি যা বলতে এসেছি, তা রাখা—না-রাখা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তবে—

ছেলেটির বাকচাতুর্য বিনয়বাবুকে আকর্ষণ করে।

তিনি শান্তগলায় বললেন, আপনি বলুন। আমি শুনছি।

—আপনাদের জুপিটার বিজনেস্ কনসার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের সিনিয়ার অর্গানাইজার সুশান্ত চৌধুরী আমার বাবা।

···আই সি। সুশান্তবাবুকে বিলক্ষণ চিনি। এরকম সৎ ভদ্রলোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না।

—তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়ে যাওয়ায় আপনার কাছে আমায় আসতে হল।

বিনয়বাবু দ্রুতগলায় বললেন, বিপদ! কোন এ্যাক্সিডেন্ট—!

—না। সাধারণ কোন দুর্ঘটনা হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আপনি আমার বক্তব্য অনুগ্রহ করে শুনুন। কাল বাবা ওরিয়েণ্ট স্পিনিং মিল থেকে কুড়ি হাজার টাকার কালেক্শন্ নিয়ে ফিরছিলেন, পথেই টাকাটা খোয়া গেছে।

বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন বিনয় রক্ষিত। সেই সঙ্গে অপর্ণাও।

—খোয়া গেছে! বলেন কি ? টাকাটা খোয়া গেল কিভাবে ?

সুস্নাত দুজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল কোম্পানীর গাড়ি বাবা নিজেই ড্রাইভ করে ফিরছিলেন। যশোর রোডের এক বাঁকে একটা জীপ অতর্কিতে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজন বন্দুকধারী তাঁর কাছ থেকে টাকার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। এ

ধরনের রাহাজানির কথা আমরা খবরের কাগজে আগেও পড়েছি। আপনি বাবাকে চেনেন। এবং তাঁর সততার কথা জানেন। আত্মসম্মানে ঘা লাগতে পারে এই ভয়ে তিনি অফিসে একথা এখনও জানাননি। তাঁর আজীবনের সততার উপর একটা বিরাট আঘাত পড়তে পারে এই সম্ভাবনায় মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছেন।

সুস্নাত থামল।

বিনয়বাবু পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার মরিয়া হয়ে যেন আরম্ভ করল সুস্নাত, আপনার কাছে এলাম—না এসে উপায় ছিল না, আপনিই তাঁকে পূর্ব-সুনামের সঙ্গে এবং সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে পারেন।

—আমি! বিনয়বাবু হতবাক!—আমি কিভাবে তাঁকে বাঁচাতে পারি বলুন?

—আপনি বাবাকে যদি কিছু সময় দেন টাকাটা পরিশোধ করবার—সকলের অজান্তেই তাহলে সুষ্ঠুভাবে ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছেলেটির নিঃসঙ্কোচ কথাবার্তা কিছুটা বিহ্বলই করে তোলে যেন বিনয়-বাবুকে। ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মিনিট তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর বেশ সহজভাবেই বলেন,—তুমি কি কর? তুমি বলে সম্বোধন করলাম বলে কিছু মনে করোনা। আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়।

একটু আশ্চর্য হয়ে সুস্নাত বলল, না না, মনে করবার কি আছে। আমি অধ্যাপনা করি।

—কি সাবজেক্ট তোমার?

—ইতিহাস।

—বহুবছর আগে যারা মরে হেজে গেছে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে?

—ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসের উপর আমার ভীষণ ঝোঁক। কিন্তু—

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু।

—আমার প্রশ্নগুলো তোমাকে অবাক করেছে বুঝতে পেরেছি। তোমার বাবার কথা আমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। কাল দুপুরে আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবে। টেবিলের ওপর থেকে নিজের একখানা কার্ড তুলে নিয়ে তিনি সুস্নাতর হাতে দিলেন। সুস্নাত সেখানা পকেটে রেখে দিয়ে হাত তুলে দুজনকে নমস্কার জানাল। আর কোন কথা না বলে পার্লার থেকে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ অপর্ণা সম্পূর্ণ চুপ করে বসেছিল।

এবার বলল, অদ্ভুত সপ্রতিভ ভদ্রলোক।

—হ্ঁ, বেশ ছেলে।

পরের দিন দুপুর।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ব্যবধানে বিনয় রক্ষিত ও সুস্নাত বসে আছে। মিঃ রক্ষিত বলছেন, তোমার কথা গভীরভাবে চিন্তা করে আমি দেখলাম। তোমার বাবার স্পটলেশ কেরিয়ারে দাগ পড়ুক—আন্তরিকভাবে আমি তা চাই না। তবে একথা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংএ তুলে দিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই ওরিয়েণ্ট স্পিনিং মিলের সঙ্গে কথা বলে, বিশ হাজার টাকার পেমেণ্টটা আমি নিজের নামে করিয়ে নিচ্ছি। এতে সমস্ত দিক বজায় থাকবে।

এত সহজে সমস্ত কিছুর সমাধান হবে কল্পনাও করতে পারেনি সুস্নাত। কৃতজ্ঞতায় তার মন কানায় কানায় ভরে উঠল।

—আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার স্পর্ধা আমার নেই মিঃ রক্ষিত।

—তার দরকার নেই। ধন্যবাদ পাবার মত আমি কিছু করিনি। যা করেছি সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থেই করেছি।

—আপনার স্বার্থ!

বিনয় রক্ষিত সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আজকের দিনে অর্থহীনভাবে কেউ কারুর জন্য কিছু করে না। যারা করবার চেষ্টা করে তাদের মত বোকা আর কেউ পৃথিবীতে নেই।

—আমি কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—না বুঝতে পারারই কথা। আমার স্বার্থ হল, চিরদিনের জন্য আমি তোমাকে নিজের কাছে রাখতে চাই।

—নিজের কাছে! বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে চলে যায় সুস্নাত।

—বহুদিন ধরে তোমারই মত একজনকে খুঁজছিলাম।

—আমার মত! আমি কিন্তু…

—এখনও বুঝতে পারনি, এইতো? বুঝিয়ে বলছি। আমার মেয়ে অপর্ণাকে কাল তুমি দেখেছ। অতি আদরে, অতি যত্নে আমি তাকে মানুষ করেছি। তার বিয়ের বয়স হয়েছে। অথচ আমি তাকে কারুর হাতে দিতে পারছি না। কাল তোমায় দেখার পরই আমার মনে হল, আমি বোধহয় তোমাকেই এতদিন খুঁজছিলাম।

এরকম সমস্যায় সুস্নাত জীবনে পড়েনি।

কাঁপা গলায় বলতে গেল, আমাকে——

তাকে বাধা দিয়ে মিঃ রক্ষিত বললেন, আমি বিপুল অর্থের অধিকারী তা

তুমি জান। অপর্ণা ও অশোক আমার দুটি মাত্র সন্তান। আমার সমস্ত কিছুর ওপর ওদের দুজনের সমান দাবী। কাজেই—

কিন্তু——

—তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী নাও হতে পার। তবে ওই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে তোমার বাবার কথাও। এই বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ কারাবাস তাঁর পক্ষে বোধহয় স্বাস্থ্যকর হবে না।

সুস্নাত উঠে দাঁড়াল।

একটা অজানা আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সমস্ত মুখ ভিজে উঠল।

মিঃ রক্ষিত নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

সুস্নাতর পিঠে একটা হাত রেখে মৃদু গলায় বললেন, এই মুহূর্তে আমার উত্তর চাই না। আমি তোমায় তিন দিন ভেবে দেখবার সময় দিচ্ছি।

সুস্নাত আর দাঁড়াল না। একরকম দৌড়ে বিনয় রক্ষিতের অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে—থামিয়ে তাতে চড়ে বসল। গাড়ি ছেড়ে দেবার পরই চিন্তার বিরাট সমুদ্রে সুস্নাত ডুবে গেল। এখন তার কর্তব্য কি? আজীবন বাবা তাকে যে স্নেহ, যে নিষ্ঠা দিয়ে মানুষ করে এসেছেন তার প্রতিদানে কি…কিন্তু সুদীপা…… তাকেও তো সুস্নাত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল এই সময়। ড্রাইভার জানতে চাইছে গন্তব্যস্থল কোথায়?

সুদীপার সঙ্গে পরামর্শ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

—থিয়েটার রোড।

থিয়েটার রোডের গোঁল্ড মেমোরিয়াল স্কুলের মিউজিকাল টিচার সুদীপা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল বাগানে। এখানে দুজনের কতবার দেখা হয়েছে। সুস্নাতর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুদীপা।

—একি, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

—সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল দীপা। তুমি—তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে? কোন অঘটন যে ঘটেছে পরিষ্কার বুঝতে পারল সুদীপা। ও নীরবে সুস্নাতকে অনুসরণ করল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিকের ঘাসের কার্পেটের ওপর ওরা এসে বসল দুজনে পাশাপাশি। সুস্নাত একে একে বলে গেল সবকথা। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সুদীপা সমস্ত শুনল। দুজনেই চুপচাপ তারপর।

এই নির্জন দুপুরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে খুব বেশি লোক নেই। দূরে

দূরে কয়েকজন ঘাসের ওপর শুয়ে বসে আছে। দূরের চৌরঙ্গী রোড থেকে বাস ও ট্রামের মিলিত যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে থেকে থেকে।

এক সময় সুদীপাই নীরবতা ভঙ্গ করল।

—তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা তোমার সামনে। প্রতিবারের মত এবারও তোমায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

—তুমি আমায় কি করতে বল ?

—তুমি তোমার কর্তব্য করবে।

—কর্তব্য !

—আজীবন বাবা যেমন আপ্রাণভাবে সমস্ত কিছু করে এসেছেন, আজ তাঁর বিপদে তোমাকে আপ্রাণভাবে করতে হবে।

—কিন্তু তুমি—তোমাকে আমি কিভাবে ছেড়ে থাকব দীপা ?

সুস্নাত ওকে কাছে টেনে আনল। উন্মুক্ত পরিবেশের কথা একেবারেই তার মনে রইল না।

—সমস্ত ভালবাসার পরিণতি বিয়ে, একথা তোমায় কে বলল ?

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়, কোন দ্বিধা নয়। ভেবে দেখ আমি কি বলছি। তুমি কি মনে কর আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না ?

সুস্নাত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শীর্ণ গলায় বলল, তুমি আমায় কথা দাও দীপা, বাহ্যিক সম্পর্কে আমাদের যতই ব্যবধান আসুক না কেন, আজীবন তুমি অন্তর দিয়ে আজকের মতই আমার হয়ে থাকবে—বল দীপা ?

—আমি তো তোমারই।

সুদীপার দুচোখের কোণ ভিজে উঠেছে। এতক্ষণ নিজেকে কোনরকমে সংযত করে রাখলেও আর পারল না। সুস্নাতর বুকে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সুস্নাত সমস্ত বুঝতে পারে। সুদীপার অন্তস্থলে এ আঘাত যে কত গভীরভাবে লেগেছে, তা অনুমান করে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভেদ্য নিরুপায়-প্রাচীর ডিঙিয়ে কিছু করবারও তো নেই।

এরপর এক বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সুস্নাতর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল অপর্ণার। বিনয় রক্ষিত নিজের কথা রাখলেন। কাক-পক্ষীও জানতে পারল না বিশ হাজার টাকার কথা। বিয়ের পর সহজভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সুস্নাত। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল, অপর্ণা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত স্বভাবের। এবং অন্য কেউ চেষ্টা করলেও ও যে নিজেকে তার সঙ্গে এ্যাড্‌জাস্ট করে নেবে, এ

সম্ভাবনা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। তার ঘাড়ে রক্ষিত সাহেবের মেয়ে গছিয়ে দেবার রহস্য ক্রমেই সরল হয়ে আসছে। মাস তিনেক কেটে গেছে।

কলেজ থেকে সবে ফিরেছে সুস্নাত, অপর্ণা এসে প্রশ্ন করল, তুমি সুদীপাকে চেন? আচম্বিতে এই প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল সুস্নাত। অবশ্য মুখে যাতে চেনার মনোভাব ফুটে না ওঠে সে বিষয়ে যত্নবান হল।

—কে সুদীপা?

—আমার পিসতুতো বোন।

—ও। এসেছিলেন নাকি তিনি?

—তুমি তাহলে তাকে চেন না?

—না। তোমাদের বাড়িতে দেখেছি বলে মনেও পড়ে না।

এবার তীব্রগলায় অপর্ণা বলল, শিক্ষিত লোক হয়ে এরকম ডাহা মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার?

—মিথ্যে কথা!

—তাছাড়া আবার কি? এগুলো কি আমি জানতে চাই? তুমি অস্বীকার করতে পার এই চিঠিগুলো আর এই ছবিখানাকে? তোমারই ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ার থেকে পাওয়া গেছে!

অপর্ণার হস্তস্থিত সুদীপার লেখা কয়েকখানা চিঠি ও ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সুস্নাত শান্ত গলায় বলল, বুঝতে যখন সবই পেরেছ তখন আমায় প্রশ্ন করে লাভ কি?

—একথা আমার সামনে বলতে তোমার আটকাচ্ছে না? ছিঃ!

—এতে ছি, ছি, করার কি আছে বুঝতে পারছি না। তোমার মনে কোন আঘাত দেবার অভিপ্রায় আমার নেই। তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহারও আমি করিনি। সুতরাং বিয়ের আগে আমি কি করেছি না করেছি সে-সব প্রশ্ন তোলা এখন সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বৈভব আর প্রশ্রয়ের মধ্যে পালিত অপর্ণার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে যাচ্ছে। শরীর কাঁপতে আরম্ভ করেছে অসম্ভব রকমে।

চিৎকার করে বলল, তাই আমার বিয়েতে সুদীপা আসেনি! কোথাও মুখ লুকিয়ে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল বোধহয়! তুমি···তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে, ওকে বিয়ে করতে?

—কাউকে না কাউকে করতেই হত।

—কেন—কেন তবে আমায় বিয়ে করেছিলে?

—কেন করেছিলাম! না করে উপায় ছিল না।

—আজ তো বলবেই! সেদিন কোথায় ছিল তোমার এই গলার জোর।

আমার বাবার দয়ায় তোমার ঠগ্ জোচ্চোর বাপ সকলের সামনে মাথা তুলে বেড়াচ্ছে, আবার—

দু'চোখে আগুন ঝলসে উঠল সুস্নাতর।

—অপর্ণা—! কথা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার। তোমার বলা উচিত নয় তবু তুমি আমায় যা ইচ্ছে বলছ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বাবাকে ছোট করার অধিকার তোমার নেই।

সুস্নাত আর অপেক্ষা করল না। এ ঘটনার কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এই শুরু। এরপর খিটিমিটি ঝগড়া লেগেই থাকত। অবশ্য এক তরফা। অপর্ণার তীব্র বাক্যবাণের বিরুদ্ধে সুস্নাত আর মুখ খুলত না মোটেই। এইভাবে কোনরকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিধাতার এও বোধহয় মনঃপুত ছিল না।

একদিন—

বাপেরবাড়ি গেছে অপর্ণা। দিন কয়েক থাকবার ইচ্ছে নিয়েই গেছে। এখানে সুদীপা সংক্রান্ত ব্যাপারটা এখন কারুর আর অজানা নয়। কাজেই অপর্ণাকে নানাভাবে প্রফুল্ল রাখার জন্যে সকলেই ব্যস্ত।

অশোক বলল, আজ দিনটা বেশ। আমার ছুটিও আছে। চল, মোটরে ডায়মণ্ডহারবারে ঘুরে আসি।

অপর্ণা বলল, ডায়মণ্ডহারবারে তো সেদিন গেলাম দাদা। তার চেয়ে ব্যারাকপুর চল, গান্ধীঘাট ঘুরে আসি।

ব্যারাকপুরে যাওয়াই স্থির হল।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। সত্যি, বেশ দিনটা আজ। ঠাণ্ডা আমেজের সঙ্গে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। রোদ্দুরের ছিটে-ফোঁটাও কোথাও নেই।

ব্যারাকপুর পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না।

বহুলোক এসেছে বেড়াতে! গান্ধীঘাট জমজমাট।

সারা দিয়ে পাল তোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। অপূর্ব! অপর্ণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গঙ্গার দিকে। এক সময় দূরে বাঁকের মুখে নৌকা-গুলো মিলিয়ে গেল। গান্ধীজীর জীবন-কথা যেখানে খোদাই করা আছে, অপর্ণা সেইদিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগুতেই একটা অভাবনীয় দৃশ্য চোখে পড়ল—স্তম্ভিত হয়ে গেল অপর্ণা।

সুস্নাত ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদীপার সঙ্গে। কি যেন বোঝাচ্ছে ওকে। গান্ধীজীর সম্বন্ধেই হয়তো কিছু।

অপর্ণার গলা চিরে আর্তরব বেরিয়ে এল, দাদা—

অশোক তখন একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। ও ফিরে তাকাল ব্যগ্র-

ভাবে। অপর্ণা আর কিছু না বলে, অশোকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল গাড়ি যেখানে পার্ক করা রয়েছে সেইদিকে।

সুস্নাত বাড়ি ফিরল প্রায় বেলা একটায়।

অপর্ণা বাপের বাড়ি গেছে। নিশ্চিন্ত মনে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের ঘরে এল। খাওয়ার পাট চুকিয়ে এসেছে হোটেল থেকে। নিজের ঘরে পা দিয়েই কিন্তু অবাক হল। একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে অপর্ণা।

সুস্নাত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তুমি—!

বারুদের স্তূপে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিলে যে বিধ্বংসী কাণ্ড সংঘঠিত হয়, তার চেয়ে কোন অংশে কম দূরে ঘটনাটা এরপর গড়াল না। এমন একটা বিশ্রী মনোমালিন্য ঘটে গেল যা তাদের অসুখী বিবাহিত জীবনেও অভুতপূর্ব।

সুস্নাত অবশ্য অপর্ণার সঙ্গে তাল রেখে যেতে পারেনি। ওকে অনেকভাবে অনেক কথাই বোঝাবার চেস্টা করল। ফল আশাপ্রদ হল না বলা বাহুল্য।

দেওয়ালের সঙ্গে ফিক্সড করা আয়রন চেস্ট থেকে অপর্ণা গয়নার বাক্সটা বার করি নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে বলল, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ—। এ বাড়িতে আর পা দেব না।

ও দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল।

সুস্নাত ওর পিছু পিছু এসে বলল, আমি তোমায় যেতে বলিনি।

—তা বলবে কেন! স্বার্থপর, সুবিধাবাদীর মত দু'দিকই বজায় রাখবার চেস্টা করেছ—আমার টাকা আর সুদীপার সঙ্গে ঢলাঢলি।

—বাধা দিলে শুনবে না জানি। যাচ্ছ, যাও। বাবা বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলে তাঁকে বলে যেও।

—তোমার বাবা! থাক, আদিখ্যেতায় কাজ নেই।

অপর্ণা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল।

—শোন অপর্ণা···

—না···না···

কিন্তু কথা আর শেষ হল না, টাউরি খেল ও। সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে চলল দেহটা। শেষ ধাপে এসে যখন থামল তখন রক্তাক্ত অপর্ণার জ্ঞান নেই। গয়নার বাক্সর ডালা খোলা অবস্থায় ছিটকে পড়েছে একেধারে। ছড়িয়ে গেছে গয়নাগুলো মেঝের ওপর।

পলকের মধ্যে সমস্ত ঘটে গেল যেন।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

সংবাদ পেয়ে বিনয় রক্ষিত ছুটে এলেন স্বয়ং। ঘটনার সূত্রপাত কি থেকে অনুমান করলেন বোধহয়। মেয়েকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। শহরের সেরা চিকিৎসকদের আহ্বান করা হল।

তাঁরা রোগিণীকে একাগ্রতার সঙ্গে পরীক্ষা করে সুচিন্তিত অভিমত দিলেন। আঘাত তেমন গুরুতর নয়। সিঁড়ির ধাপ আর রেলিং-এর ঘষড়ানিতে চামড়া ছিঁড়ে গেছে মাত্র। দু-একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে রোগিণীর চাই এখন পূর্ণ বিশ্রাম। তবে গুরুতর একটা বিষয় প্রকট হয়ে উঠেছে, ইনি অত্যন্ত দ্রুত কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন।

সুস্নাত কোন সঙ্কোচ না করেই স্ত্রীর কাছে গেছে। বিনয়বাবু আপত্তি করেননি। ক্রমেই তিনি এই সমস্ত ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করতে চেয়েছেন।

নির্বিবাদে দিন কেটে যেতে লাগল।

দিনের বেলা সকলে পালা করে অপর্ণাকে দেখাশুনা করেন। রাত্রে একাই সমস্ত দায়িত্ব সুস্নাত গ্রহণ করে। প্রতিদিন সুশান্তবাবু পুত্রবধূকে দেখে যান। দুর্ঘটনার দিন·········সশব্দে ন'টা বাজল।

চটকা ভাঙল নির্মল পালিতের। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। দক্ষিণের জানলাটার সামনে থেকে সরে এসে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনেকার রিভলবিং চেয়ারে অবসন্নের মত বসলেন। সুস্নাতর মুখ থেকে যা শুনেছিলেন তা যে কেবল তাঁর নথিপত্রেই লেখা আছে তা নয়, বরং পরিষ্কার মনেও আছে। দুর্ঘটনার দিন সুস্নাত রাত প্রায় ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে অপর্ণার ঘরে যায়। অপর্ণা তখন জেগেই ছিল। স্বামীকে দেখে মুখ ফিরিয়ে শুল। সুস্নাত বাক্যব্যয় না করে কৌচে গিয়ে বসল—সেণ্টার টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিয়ে মনোনিবেশ করল তাতে।

কয়েক মিনিট কেটেছে বোধহয়, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল সন্ত্রাসে। সুস্নাত উঠে গিয়ে ক্রেডলের ওপর থেকে রিসিভার তুলে নিল। নিচে লাইব্রেরী ঘরে বিনয়বাবু তাকে আহ্বান করছেন। হঠাৎ কি দরকার পড়ল!

সুস্নাত একতলায় নেমে লাইব্রেরী ঘরে গেল।

জামাইকে দেখে বিনয়বাবু বললেন, কাল চেম্বার অফ কমার্সে আমার একটা বক্তৃতা আছে। দেখ তো ঠিক লেখা হয়েছে কিনা।

সুস্নাত বক্তৃতা লেখা কাগজগুলো হাতে নিল।

বিনয়বাবু আবার বললেন, তোমায় কিছু অসুবিধায় ফেললাম অবশ্য। বিশ্রামের সময় এখন—। সেক্রেটারি আজ অনুপস্থিত বলেই······!

—না, না আমার অসুবিধা হবে না। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমি লেখাটা দেখে রাখছি।

বিনয়বাবু উপরে চলে গেলেন।

বিশদভাবে বক্তৃতাটা সংস্কার করতে গিয়ে বেশ সময় লেগে গেল। বিনয়বাবু যা লিখেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা বক্তৃতার ফর্মে'ই লেখা নই। পৌনে বারটা বেজে গেল। সুস্নাত হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।

এবার গিয়ে শুয়ে পড়বে। অপর্ণা এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে বেরুবার মুখেই অভাবনীয় এক ব্যাপার ঘটল। রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল আর্ত চিৎকারে এবং তারপরই গুরুভার কিছু পতনের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

কয়েক সেকেণ্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুস্নাত। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। বারান্দায় দেখা হল চাকর কানাইয়ের সঙ্গে। দুজনকে বেশি দূর যেতে হল না, উঠানের একধারে অপর্ণার রক্তাক্ত দেহটা দেখতে পাওয়া গেল।

নিথর, নিষ্কম্প—তার দেহে বোধহয় প্রাণ নেই।

অবিলম্বে বাড়ির অন্যান্য সকলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। পুলিশে সংবাদ পেঁছাতে বিশেষ বিলম্ব হল না। তারপর···

ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরালেন নির্মল পালিত।

ঝুঁকে পড়লেন ব্রিফের ওপর।

তিন দিন ধরে বহু সাক্ষীকে জেরা করলেন রণদাকান্ত চৌধুরী।

সাক্ষী শেষ হলে নিজের বক্তব্যের সার কথা বিবৃত করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ইওর অনার এবং মান্যবর জুরিগণ, আমি নিজের সুচিন্তিত অভিমত পূর্বেই ব্যক্ত করেছি এবং এই ক'দিন ধরে সাক্ষীদের জেরা করে যা জানতে পারা গেছে তাতে আমার বক্তব্য স্বাভাবিক-ভাবে আশাপ্রদ হয়েছে বলা চলে। এটি একটি নিষ্ঠুর হত্যা। শিক্ষিত ও রুচিশীল হয়েও আসামী সুস্নাত চৌধুরী এই জঘন্য অপরাধ করেছে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, পরিকল্পনা করে।

প্রশ্ন উঠবে এই হত্যার উদ্দেশ্য কি? সাক্ষীদের বক্তব্যে তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আসামী নিজের মেলাঙ্কোলিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীকে হত্যা করে সকলের মনে এই ধোঁকার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে যে, কোন দুর্বল মুহূর্তে অপর্ণা দেবী নিজেই উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ইওর অনার, আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। শুধু একটি অনুরোধ আছে, আসামীর গুরুতর অপরাধের কথা চিন্তা করে তাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক।

রণদাকান্ত নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

আজও আদালতগৃহ লোকে-লোকারণ্য। খবরের কাগজে অপর্ণার হত্যা-

সংক্রান্ত সমস্ত কিছু ফলাও করে প্রকাশ করার দরুন সাধারণের মনে এই ঔৎসুক্য।

আসামী পক্ষের নির্মল পালিত এবার উঠে দাঁড়ালেন।

এই তরুণ সুদর্শন আইনজীবীর খ্যাতি অল্প নয়। তিনি গম্ভীর গলায় বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার এবং মান্যবর জুরিগণ, কয়েক দিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমার প্রবীণ সহযোগী সুস্নাত চৌধুরীকে দোষী প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই আসামীকে নির্দোষ বলে অভিহিত করে এসেছি। এই বিশ্বাসের পিছনে কয়েকটি কারণ আছে তা এবার আমি একে একে প্রকাশ করব।

সুস্নাত চৌধুরীর সঙ্গে সুদীপা রায়ের গভীর ভালবাসা ছিল একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এর জন্য আসামী নিজের বিবাহিত-জীবনকে কখনই অশান্তিময় করে তুলতে চাননি। তিনি সুন্দরভাবে অপর্ণা দেবীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটা ঈর্ষা, একটা বিরূপ মনোভাব অপর্ণা দেবীকে ভেতরে ভেতরে খেয়ে যাচ্ছিল। যার জন্য দুরূহ মেলাঙ্কোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একথা ভেবে নিলে নিতান্ত অসঙ্গত হবে না যে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত অপর্ণা দেবী স্বামীকে বিপদে ফেলবার জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিংবা তাকে অন্য কেউ ওইভাবে হত্যা করেছিল। এই কেসটি হল পুলিশের শোচনীয় অক্ষমতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেস তাঁরা ভালভাবে টেক-আপ করতে পারেননি। পারলে আজ সুস্নাত চৌধুরীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত না। আমি এবার সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে সেই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। আদালতের বেশি সময় আমি নেব না। অগণিত সাক্ষী আমার নেই।

মাত্র তিনজনকে আহ্বান জানাবার অনুমতি দেবার পর নির্মল পালিতের অনুরোধে প্রথমে সাক্ষ্য-মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন বিনয় রক্ষিত। আনুষ্ঠানিক কাজগুলো দ্রুত শেষ করলেন তিনি।

নির্মল পালিত প্রশ্ন করলেন, আপনি স্থির নিশ্চিত যে, আসামী সুস্নাত চৌধুরীই আপনার মেয়েকে হত্যা করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার এই নিশ্চয়তার পিছনে কোন সবল কারণ আছে কি ?

—কারণ…!

—বলুন—বলুন—থামবেন না ?

—আমি জানি একাজ একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

—অথচ আপনি নিজেই তাকে পছন্দ করে জামাই করেছিলেন।

বিনয় রক্ষিত নীরব রইলেন।

—ওয়েল, আপনার বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই ?

—করুন।

নির্মল পালিত সাক্ষ্য-মঞ্চের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন।

—শুনেছি, বিয়েতে মেয়েকে কয়েক লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ।

—যৌতুকের সঠিক পরিমাণ কত জানালে ভাল হয়।

—পাঁচলক্ষ টাকা নগদ ও কলকাতায় দু'খানা বাড়ি।

—অপর্ণা দেবীর মৃত্যুর পর এখন নিশ্চয় এ সমস্ত আপনার জামাইয়ের প্রাপ্য।

ইতস্ততঃ করতে লাগলেন বিনয় রক্ষিত।

—বলুন—বলুন—

—না। অপর্ণা মারা যাবার দিন পঁচিশেক আগে উইল করেছিল।

—উইল! আপনি নিশ্চয় বলবেন, সে উইলে বাড়ি দুখানা ও নগদ টাকা কাকে দিয়ে গেছেন ?

—বাড়ি দুখানা ও একলাখ টাকা সে দিয়েছে তার দাদা অশোককে। বাকি চারলাখ টাকার মধ্যে, অশোকের বন্ধু গৌরকে পঞ্চাশ হাজার ও আমার ম্যানেজার হরিশঙ্কর সেনকে পঞ্চাশ হাজার। তিনলাখ টাকা দিয়ে গেছে স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েদের সুস্থভাবে জীবনধারণ করবার সুযোগ দেবার জন্য একটি সমিতিকে।

—তার মানে নিজের স্বামীকে তিনি একটি পয়সাও দিয়ে যাননি।

এবার দুর্ঘটনার দিনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক। সেদিন আপনি রাত দশটার সময় টেলিফোনে সুস্নাতবাবুকে নিচে লাইব্রেরি ঘরে ডেকেছিলেন ?

হ্যাঁ।

—কেন ?

—আমার সেক্রেটারী অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিল। তাই ওকে ডেকে-ছিলাম একটা লেকচার কারেক্ট করে দেবার জন্য।

—আপনার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। দুপুরেই যখন বুঝতে পারা গিয়েছিল সেক্রেটারি আসবে না, তখন সমস্ত দিন, বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যে আপনি লেকচার কারেক্ট করিয়ে না নিয়ে এত রাত্রে সুস্নাত চৌধুরীকে ডাকলেন কেন ?

—না, মানে···

নির্মল পালিত বললেন, তাছাড়া লেকচারের কপি আপনি শুতে যাবার আগে তাঁকে দিয়ে আসতে পারতেন অপর্ণা দেবীর ঘরে। কোন অসুবিধা ছিল

না। তবু তাঁকে লাইব্রেরী ঘরে ডেকে নিয়ে যাবার কোন সঙ্গত কারণ আছে মিঃ রক্ষিত ?

—কারণ—কারণ কি থাকতে পারে, আমি কোন কিছু না ভেবেই ওকে লাইব্রেরী ঘরে ডেকেছিলাম।

থতমত খেয়ে কোনরকমে কথাটা শেষ করলেন বিনয় রক্ষিত।

—ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই আমার।

বিনয় রক্ষিতের পর আহ্বান করা হল রক্ষিত বাড়ির পুরনো চাকর কানাইকে। বেঁটে খাটো কালো কুচকুচে মানুষ। মাথার চুল কালোর চেয়ে সাদাই বেশি।

নির্মল পালিত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, তোমার নাম কানাই ?

—আজ্ঞে বাবু।

—তোমাদের জামাইবাবু কিরকম স্বভাবের লোক ?

—আজ্ঞে খুব ভাল লোক। দয়া মায়া আছে শরীরে।

—আচ্ছা কানাই, যেদিন তোমাদের দিদিমণি মারা যান, সে রাত্রের সমস্ত কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে ?

—আছে বাবু। তা কি ভোলা যায় !

—আমায় গুছিয়ে বল তো।

কানাই নিজের শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, আজ্ঞে সেদিন রাত প্রায় এগারটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে সদরের দিকে যাচ্ছিলাম। বারান্দাটা পার হবার সময় চোখে পড়ল বই-পত্তরের ঘরে আলো জ্বলছে। উঁকি দিয়ে দেখলুম, জামাইবাবু লেখাপড়া করছেন। আমি সরে এসে সদর দরজার সামনে গিয়ে বসলুম।

—তারপর ?

—দারোয়ান প্রেম সিং-এর সঙ্গে কথা কইছিলুম। কতক্ষণ কথা হয়েছে জানি না—এক সময় খুব জোরে চিৎকার আর কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। ছুটে উঠানে গিয়ে দেখি দিদিমণি পড়ে রয়েছেন।

—সে সময় তোমার জামাইবাবু সেখানে ছিলেন ?

—আজ্ঞে। তিনিও বই-পত্তরের ঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন।

—তুমি ঠিক জান, সে সময় তোমার জামাইবাব বই-পত্তরের ঘর থেকেই ছুটে আসছিলেন ?

—আজ্ঞে বাবু। আমি যে দেখলুম, তিনি আমার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কানাইকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না নির্মল পালিত।

কানাইয়ের পর সাক্ষ্য-মঞ্চে এসে দাঁড়াল সুদীপা রায়। পালিতের শেষ সাক্ষী। প্রশ্ন আরম্ভ হল।

—আপনার সঙ্গে সুস্নাতবাবুর কি দীর্ঘদিনের আলাপ ছিল ?

ম্রিয়মান কণ্ঠে সুদীপা বলল, আমাদের আলাপ বছর চারেকের ওপর।

—আপনাদের দুজনের বিয়ে হবার কথা ছিল কি ?

—হ্যাঁ।

—হল না কেন ?

—পারিবারিক কারণে ও অপর্ণাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল।

—আপনি এতে আপত্তি করেননি ?

—না। আমি বার বার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওকে অনুরোধ করেছিলাম অপর্ণাকে বিয়ে করতে।

—আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, পুলিশের মতে সুস্নাত চৌধুরী আপনারই জন্য অপর্ণা দেবীকে হত্যা করেছেন ?

—শুনে আশ্চর্য হয়েছি।

—কেন ? কেন আশ্চর্য হয়েছেন মিস্ রায় ?

—আশ্চর্য না হবার তো কোন কারণ নেই। আমানের দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপাড়া ছিল। ওর বিয়ের পরও আমরা আগেকার মতোই মেলা-মেশা করেছি। অপর্ণাকে খুন করার কোন সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না।

—ধন্যবাদ সুদীপা দেবী আপনাকে আর কষ্ট দেব না, আপনি যেতে পারেন এবার। সুদীপা সাক্ষ্য-মঞ্চ থেকে যাবার পরই, নির্মল পালিত বিচারপতির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনার দরুন কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর ওনার, আমার আর কোন সাক্ষী নেই। তিনজন সাক্ষীর মুখ থেকে আমরা যা শুনেছি তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় আসামী সুস্নাত চৌধুরী সম্পূর্ণ নির্দোষ। অপর্ণা দেবীকে হত্যা করার তাঁর কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। কারণ সুদীপা দেবীর সঙ্গে বোঝাপড়ার পরই এবং একরকম তাঁরই অনুরোধে আমার মক্কেল অপর্ণা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। আগেকার ভালবাসা সুদীপা দেবীর সঙ্গে তাঁর বজায় ছিল। সুতরাং পুলিশ যে মোটিভ খাড়া করেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর যে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হয়েছিল তাও নয়। তাছাড়া আসামী চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও শান্ত হিসেবে খ্যাত। পাব্লিক প্রসিকিউটর হীরের টুকরো ছেলের স্বভাব থেকে কেমন ঝিলিক বেরুচ্ছে এই মন্তব্য করে বিদ্রূপ করেছেন। এই মন্তব্য করাটা কতটা শোভন হয়েছে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করে দেখবেন। আমাদের এদিকটাও ভেবে দেখতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী, নির্মল স্বভাবের অধিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ সম্ভব কিনা।

ইওর অনার এবং মান্যবর জুরিগণ, এবার দুর্ঘটনার দিনের কথায় আমি আসতে চাই, সেদিন ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্নাত চৌধুরীকে অপর্ণা দেবীর ঘর থেকে সরিয়ে নীচে লাইব্রেরীতে আনা হয়েছিল। যে কাজ সহজেই তেতলার ঘরে সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল—তবু আমার মক্কেলকে বাধ্য করা হয়েছিল নিচে নেমে আসতে। এই একটি ব্যাপারেই আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি আসামীর বিরুদ্ধে কেমন গভীর ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল। চক্রান্তকারীরা চমৎকারভাবে কাজ সমাধা করেছে। প্ল্যান সুন্দরভাবে খাড়া করা হয়েছিল সুশান্ত চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে অপর্ণা দেবীকে খুন করা হবে অথচ পূর্ব-ঘটনার পরম্পরার দরুন পুলিশ গ্রেপ্তার করবে তাঁকে। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। কিন্তু বাড়ির পুরানো চাকর কানাই-এর কথায় চক্রান্তকারীদের সে চক্রান্ত আমরা ধরে ফেলেছি। কানাই সুস্নাত চৌধুরীকে লাইব্রেরী ঘরে দেখেছিল। এমন কি অপর্ণা দেবী উপর থেকে পড়ার পরই কানাই ও আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসামী চৌধুরী সত্যিই যদি নিজের স্ত্রীকে তেতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দেহ উপর থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচে উঠানে আসামীর উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। অথচ উনি ছিলেন। এতে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছে, আমার মক্কেল সুস্নাত চৌধুরী সম্পূর্ণ নির্দোষ। দ্যাটস্ অল্, ইওর অনার।

এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে বলবার পর নির্মল পালিত থামলেন। রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কিন্তু আদালতের কাজ এগোল না আর। বিচারপতি কেসটিকে আজকের মত মুলতুবি রাখলেন।

দিন কুড়ি কেটে গেছে।

গম্ভীর মুখে অফিস ঘরে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছেন বিনয় রক্ষিত। গতকাল অপর্ণা-হত্যা কেসের রায় বেরিয়ে গেছে। আজ তা ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেক দৈনিকপত্রে। রায় দেবার শেষে পুলিশ সঠিক-ভাবে এই কেস সাজাতে যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সে সম্পর্কে বিচারপতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন—একথাও ছাপা হয়েছে।

নির্দোষ হিসেবে সুস্নাত মুক্তি পেয়েছে।

বিনয় রক্ষিত ভাবছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, অপর্ণাকে হত্যা করার পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। সুস্নাত অনর্থক ভুগল এতদিন। সে সেই

চক্রান্তজালেই জড়িয়ে পড়েছিল। এরকম দুর্ভাগ্য এড়িয়ে যাওয়া ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে সেই চক্রান্তকারী?

কে খুন করেছে অপর্ণাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু। ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। রায় প্রকাশিত হবার পর থেকেই তিনি ভাবছেন। এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এক সময় তিনি নিজের মনস্থির করে ফেলেন—তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে যে হত্যা করেছে, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে এ তিনি হতে দেবেন না।

বেল টিপে ম্যানেজার হরিশঙ্করবাবুকে ডেকে পাঠালেন তিনি। এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হল। বিনয়বাবুকে হরিশঙ্কর বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। হয়তো নিজের কেউ এ চক্রান্তে জড়িত। যা হবার হয়ে গেছে। কি হবে ও সমস্ত নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে?

বিনয়বাবুকে নিরস্ত করা গেল না। তিনি প্রাইভেট এনকোয়ারী করিয়ে হত্যাকারীকে ধরবেনই। টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোন গাইড তুলে নেন। পাতা ওল্টাতে থাকেন। ব্যগ্রভাবে খুঁজতে থাকেন কার যেন ফোন নম্বর।

মিনিট কয়েক আগে দশটা বেজে গেছে।

দুশো একচল্লিশের কে, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির ড্রইংরুমে বাসব কৌচে আধশোয়া অবস্থায়, অলসভঙ্গিতে একটা আমেরিকান ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। শৈবাল বসেছিল আরেকটা কৌচে। গভীর মনঃসংযোগে কি একটা বই পড়ছিল। টিক্‌টিক্‌ শব্দ তুলে ওয়ালক্লকের কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছিল।

এইভাবেই আছে দুজনে অনেকক্ষণ।

ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে টেলিভোন বেজে উঠল এক সময়।

বাসব রিসিভার তুলে নিল হাত বাড়িয়ে,—হ্যালো—

—আমি বাসব ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলুন?

এরপর কথার আদান-প্রদান চলল কিছুক্ষণ। এক সময় রিসিভার নামিয়ে রাখল বাসব। আবার এলিয়ে পড়ল কৌচে। উৎসুক শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কে ফোন করছিল আমায় জানো?

—কে?

সুবিখ্যাত ধনী বিনয় রক্ষিত।

—হঠাৎ—কি ব্যাপার ?

—তোমার স্মরণশক্তিকে প্রশংসা করতে পারলাম না ডাক্তার। দিনের পর দিন ধরে অপর্ণার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পড়ার পর, এখন যদি…

—ও! ওই সম্বন্ধেই…কিন্তু কেস তো শেষ হয়ে গেছে।

—কেস অবশ্য শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়েনি। মিঃ রক্ষিত আমার সাহায্যে কন্যার হত্যাকারীকে ধরতে চান। তিনি এখুনি এসে পড়বেন।

আধ ঘণ্টাটাক পরেই বিনয় রক্ষিত দেখা দিলেন। বাসব তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল। আগন্তুককে খুঁটিয়ে দেখল শৈবাল। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। ধারাল মুখ। চওড়া কপাল। চিন্তার ভারে মুখ থম্ থম্ করছে।

বিনয়বাবু ফোনে বলেছিলেন তবু আরেকবার নিজের মনের কথা গুছিয়ে বললেন বাসবকে। একথাও জানালেন, যে গেছে সে অবশ্য ফিরে আসবে না; হত্যাকারী যদি ধরা পড়ে মনে কিছুটা শান্তি পাবেন। এরপর বাসবের অনুরোধে আদ্যোপান্ত ঘটনা তিনি একে একে বর্ণনা করলেন।

একাগ্রমনে সমস্ত শোনার পর বাসব প্রশ্ন করল, আদালতের রায় বেরুবার আগে, আপনার জামাই যে খুন করতে পারেন না এ ধারণা আপনার মনে কোনদিন স্থান পেয়েছিল কি ?

একটু চুপ করে থেকে বিনয় রক্ষিত বললেন, এক এক সময় মনে হত সুস্নাত হয়তো একাজ করেনি। তাকে তো সত্যিই আমি লাইব্রেরী ঘরে এনে আটকে রেখেছিলাম।

—আপনার নিজের ঘর বাড়ির কোন্ তলাতে ?

বাসবের প্রশ্ন করার ধরনে শৈবাল অবাক হল।

—তেতলাতে।

—আপনি যখন সুস্নাতবাবুকে নীচে লাইব্রেরী রুম থেকে রিং করেন তখন দশটা বাজে। শুতে আপনাকে তেতলাতেই যেতে হত, কাজেই তাঁকে নিচে না ডেকে সহজেই তেতলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, অথচ—

—আদালতেও আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। কেন সেদিন তাকে ফোনে নিচে ডেকেছিলাম একথা ভেবে সময় সময় আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই।

—সম্পূর্ণ—।

—পরের দিন আপনি আর্টিকেলটা সুস্নাতবাবুকে দিয়ে করেকশন করিয়ে নিতে পারতেন ?

—দুপুরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আজ সেক্রেটারী আসবে না। লেখাটা কাউকে না দেখিয়ে নিলেই নয়। আমার ছেলে অশোক বলল সুস্নাতকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে। কাজেই—

—হ্ুঁ। আমি সন্ধ্যার সময় আপনার ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু—

বাসব হাসল।

—বলুন ?

—আপনি যদি প্রকৃতই এই ঘটনার নিষ্পত্তি চান, তাহলে আপনার এবং আপনার বাড়ির আর সকলের পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

—নিশ্চয়ই। ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন বিনয় রক্ষিত।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিত লজে উপস্থিত হল।

আধুনিক ধাঁচের তেতলা বাড়ি। পথিকদের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করে সন্দেহ নেই। বাড়ির আয়ু বছর দশেকের বেশি নয় এক নজর দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

পার্লারেই বাসবের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বিনয়বাবু।

প্রারম্ভিক দুচার কথার পর বাসব বলল, আমি প্রথমেই অপর্ণা দেবীর ঘরখানা দেখতে চাই।

—আসুন।

বিনয়বাবু নিজেই ওদের দু'জনকে উপরে নিয়ে চললেন। চতুর্দিকে বৈভবের অপর্যাপ্ত নিদর্শন। গৃহকর্তার রুচিকেও প্রশংসা করতে হয়। সুন্দর মোজেক করা সিঁড়ি অতিক্রম করে তেতলায় পৌঁছাল তিনজন। সিঁড়ির মুখ থেকেই বারান্দা আরম্ভ হয়েছে। বারান্দার শেষে ঘরখানা। তালা খুলে সকলকে যেতে হল ভিতরে।

খুন হওয়ার পর পুলিশ এই ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিল। আগে একজন পাহারাওয়ালাও মোতায়েন ছিল। তদন্ত শেষ হবার পর তারা ঘরের তালা খুলে দিয়ে গেছে। ঘরখানা রিক্ততায় খাঁ খাঁ করছে। বাসব খুঁটিয়ে দেখল সমস্ত।

মাঝারি ধরনের ঘর। সুদৃশ্য দামী খাট ঘরের মাঝামাঝি পাতা। একধারে টেবিল। খানকয়েক রেক্সিনে মোড়া চেয়ার, ডানলোপিলো যুক্ত হ্যারিংটন চেয়ারও একখানা। গোদ্‌রেজের আলমারি দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের লাগোয়া বুককেস্।

হাল্কা চকলেট রংএর প্লাস্টিক পেণ্ট করা ঘরের দেওয়াল। তিন দিকে অন্য ঘর থাকার দরুন জানালা নেই। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে শুধু পর পর তিনটে জানালা। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো—শিক বা গ্রিল কিছুই নেই। বাসব একটা

জানালার পাল্লা খুলে উঁকি মারল। নিচে উঠান দেখা যাচ্ছে। উঠান থেকে জানালার দূরত্ব অনেকখানি।

মিঃ রক্ষিত, কোন্ জানালা দিয়ে অপর্ণা দেবীকে হত্যাকারী ফেলে দিয়েছিল বলুন তো? বাসবের প্রশ্ন শুনে বিনয়বাবু জানালাটা দেখিয়ে দিলেন।

বাসব সেদিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, অনুগ্রহ করে অশোকবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

বিনয়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাসব বলল, নিচে থেকে এই ঘরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগল জান—পাঁচ মিনিট।

বিস্মিত শৈবাল বলল, একথা বলছ যে?

জানালা দিয়ে ভারী কিছু যদি নিচে ফেলা হয় তবে সেকেণ্ড ছয় সাতের বেশি সময় লাগবে না।

অশোক রক্ষিত ঘরে এলেন। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে।

—আমায় ডেকেছেন?

—আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত অশোকবাবু। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন আপনার বাবা আপনার বোনের হত্যা রহস্যের তদন্ত করতে আমায় নিযুক্ত করেছেন?

—শুনেছি।

—আপনি শুনে থাকবেন, আপনাদের পূর্ণ-সহযোগিতা না পেলে আমি কিছুই করতে পারব না।

—আপনার সঙ্গে অসহযোগিতা করবার ইচ্ছা আমার নেই। তবে কোর্টে যা বলেছি তার বেশি কিছু আমার জানা আছে বলে যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে—আপনি ভুল ধারণা নিয়ে আছেন আমি বলতে বাধ্য হব।

—আপনার স্পষ্ট কথায় খুশি হলাম। তবু আমায় গোটা কয়েক প্রশ্ন করতেই হবে।

নিরুপায় ভঙ্গিতে অশোক রক্ষিত বললেন, বলুন।

—সুস্নাতবাবু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় নিশ্চয় আপনি খুশি হতে পারেননি?

—অখুশি হবারও কিছু নেই।

—আপনি বুঝতে পেরেছেন বোধহয়, আপনার বোনকে অন্য কেউ নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছে?

—হ্যাঁ। এখন ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে।

—কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

—না।

অপর্ণা দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুসারে আপনি তো বেশ লাভবান হয়েছেন, তাই না ?

ভ্রূ কুঁচকে অশোক রক্ষিত উত্তর দিলেন, শুধু আমি একা নই। অনেকেই লাভবান হয়েছে।

—দুর্ঘটনার দিন রাত দশটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন, নিজের ঘরেই কি ?

—স্বাভাবিক। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমি আগেও দিয়েছি। এবার আমায় যেতে হবে। আরজেন্ট একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

অশোক রক্ষিত আর কোন কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাসব ও শৈবালের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর ওরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিচে সিঁড়ির মুখেই বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হল ওদের।

—যাচ্ছেন ?

—আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব ভাবছি।

—বেশ তো। আমি এখুনি হরিশংকরবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কয়েক মিনিট পরেই হরিশংকর সেন দেখা দিলেন।

ঘিয়ে ভাজা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের উপরে। মুখে নির্বিকার ভাব।

—আমায় ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।

—বলুন ?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি কতদিন এখানে কাজ করছেন ?

—তা বছর কুড়ি-বাইশ হবে।

—আপনি থাকেন কোথায় ? এই বাড়িতেই ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, অপর্ণা দেবী উইল করে আপনাকে এত টাকা দিয়ে গেলেন কেন বলুন তো ? বাসবের প্রশ্নে থতমত খেলেন হরিশংকরবাবু।

আমতা আমতা করে বললেন, ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম, তাই বোধহয়…!

—হুঁ। এ বাড়ির সমস্ত রকম বিলি-ব্যবস্থা আপনার হাত দিয়েই হয় বোধহয় ?

—তা অবশ্য হয়। কিন্তু—

বাসব সিগারেটে দীর্ঘটান দিয়ে বলল, যেমন ধরুন, বাড়ির হোয়াইট-ওয়াস করান। কতদিন আগে এ বাড়িতে হোয়াইট-ওয়াস হয়েছে ?

—মাস দুয়েক হবে।

—ধন্যবাদ হরিশংকরবাবু। এবার আমাদের যেতে হবে। আপনি বিনয়বাবুকে বলে দেবেন।

অন্ধকারের বেড়াজালে কলকাতা অনেক আগেই ধরা পড়েছে।

তখন আটটা। সারাটা দিন সম্পূর্ণ নীরবেই কাটিয়ে দিয়েছে বাসব। থমথমে মুখের ভাব নিয়ে ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়িয়েছে। একটা দুর্বোধ্য চিন্তা খেয়ে চলেছে যেন ওকে কুরে কুরে। আজ ছুটি ছিল। হাসপাতালে যাবার তাড়া না থাকায় শৈবাল এখানেই রয়ে গেছে। সারাটা দুপুর বাসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সে পেসেন্স খেলে কাটিয়েছে।

বাহাদুর চা দিয়ে গেল এক সময়। দ্বিতীয়বার।

বাসব এসে কৌচে বসল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, কেসটা খুবই জটিল?

তাসগুলো প্যাকেটে ভরতে ভরতে শৈবাল বলল, খুব সরল বলেও তো মনে হচ্ছে না।

—রাইট। কিন্তু। আচ্ছা, মৃতা অপর্ণা চৌধরী কি ধরনের মেয়ে ছিলেন বল তো? মানে…ধরন বলতে আমি স্বভাব-চরিত্রের কথাই মিন করছি।

—বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে সাধারণতঃ যে ধরনের হয় ঠিক সেই ধরনের। আদুরে, জেদী, স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া—

—স্বেচ্ছাচারী? তাহলে একথাও নিশ্চয় আন্দাজ করা খুব অন্যায় হবে না, কুমারীজীবনে ভদ্রমহিলা কারুর সঙ্গে একটু ইয়েতে…পড়েছিলেন—

চায়ের পেয়ালায় শৈবাল শেষবারের মত চুমুক দিয়ে বলল, ইয়ে…অর্থাৎ… কিন্তু কার সঙ্গে?

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, কেন, গৌর বসাক।

—গৌর বসাক। মানে অশোকবাবুর বন্ধু?

—ঠিক তাই ডাক্তার। বন্ধুর বোনের পক্ষেই সাধারণতঃ ইয়েটা একটু জমে ভাল। আমার মতে, ভগবান বন্ধুর বোনেদের বোধহয় ওই জন্যই সৃষ্টি করে থাকেন। তাছাড়া দেখছ না, অপর্ণা দেবীর উইলে গৌর বসাকের নামে এতগুলো টাকা।—কেন?

—তবে দুজনের বিয়ে হল না কেন?

—বাধা ছিল নিশ্চয়ই। বিনয়বাবু প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতে পারেন। গৌর বসাকের মত সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করলে অপর্ণা দেবী বাপের এক কানাকড়িও পাবেন না, এমন একটা হাইফেন বোধহয় ছিল।

বাসব কৌচ থেকে উঠে হোয়াট নটের দিকে এগিয়ে গেল। হোয়াট নটের

ওপর সিগারেটের টিন ছিল। টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে আবার বলল, আশাকরি আর কিছুক্ষণের মধ্যে গৌর বসাক এখানে এসে পড়বেন। ফোনে আমি বিনয়বাবুকে জানিয়েছিলাম তাঁকে সন্ধ্যার পর এখানে পাঠিয়ে দিতে।

আবার দুজনে চুপচাপ।

শুধু ওয়ালক্লক একটানা নীরবতাকে ভেঙে চলেছে।

এক সময় বাসবই আবার কথা বলল, অপর্ণা দেবীর ঘরখানা নিশ্চয়ই তুমি বেশ ভাল করে দেখেছ?

—তা দেখেছি বইকি।

—অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে?

চিন্তিত গলায় শৈবাল বলল, অস্বাভাবিক! কই না—

—ঘরের জানালাগুলো দেখেছিলে কত নিচু নিচু। তুলনামূলকভাবে এই ঘরের জানালাগুলোর কথা ধরা যাক! আমরা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের কতখানি দেহের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে?

—কোমর থেকে উপরের ভাগ।

—এই হল স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ। কিন্তু অপর্ণা দেবীর ঘরের জানালাগুলোর সামনে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি তার সাইজ চলতি প্রথামত নয়। উরু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে মাত্র। তাই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে খুনীকে বিন্দুমাত্র অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি।

—তুমি বলতে চাও হত্যাকারীর সুবিধার জন্য জানালাগুলা আগে থেকেই এত নিচু করে তৈরি করান হয়েছিল?

—না। আমি বলতে চাই বাড়ির সমস্ত জানালাই হয়তো ওই ধরনের, হত্যাকারী তার সুযোগ নিয়েছিল মাত্র।

এই সময় বাহাদুর এসে দাঁড়াল। একজন অতিথির আগমনের কথা জানাল ও। বাসব ইসারায় তাঁকে এখানে নিয়ে আসবার নির্দেশ দিল।

গৌর বসাক দেখা দিলেন। নিজের পরিচয় দিলেন।

সুপুরুষ না হলেও চেহারায় চটক আছে ভদ্রলোকের। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে। হাত তুলে নমস্কার করলেন ভদ্রলোক। বাসব ও শৈবাল প্রতিনমস্কার করল। তাঁকে বসতে অনুরোধ করা হল।

আসন গ্রহণ করে গৌর বসাক বললেন, কাকাবাবু...মানে মিঃ রক্ষিতের মুখে শুনলাম আপনি নাকি আমায় ডেকেছেন?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন গৌরবাবু। অপর্ণা দেবীর নিহত হওয়া সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করব। উত্তর দিতে আপত্তি নেই নিশ্চই?

—বিন্দুমাত্র না।

বাসব উঠে গিয়ে হোয়াট নটের ওপর থেকে সিগারেটের টিন নিয়ে এল ? টিন এগিয়ে ধরে বলল, হ্যাভ ইট ?

একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, থ্যাংকস্। কি জানতে চান বলুন ?

—আপনি রক্ষিত পরিবারের সঙ্গে কতদিন ধরে ঘনিষ্ঠ আছেন ?

—ছোটবেলা থেকেই।

—অপর্ণা দেবীর সঙ্গে বেশ ভাল আলাপ ছিল আপনার ?

—স্বাভাবিক।

—কিছু মনে করবেন না মিঃ বাসক। বিশেষ ধরনের একটা প্রশ্ন করছি। শুধু আলাপ ছিল না প্রলাপও। মানে…ভালবাসা—।

—এ প্রশ্নের উত্তর কি আমায় দিতেই হবে ?

দিলে ভাল হয়।

—একটু চুপ করে থেকে গৌর বসাক বললেন, ভালবাসা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন জানি না। তবে ওকে আমার ভাল লাগত।

—আপনি অশোকবাবুর বন্ধু। আমার ধারণা বিনয়বাবুও আপনাকে স্নেহ করেন। তবু আপনাদের বিয়ে হল না কেন ?

—হয়তো হত, মাঝ থেকে সুস্নাত এসে পড়ায়… ।

—বলা বাহুল্য সুস্নাতকে তাই আপনি ভালচোখে দেখেননি কোনদিন।

—আপনার ধারণা ঠিক নয় বাসববাবু।

—সুস্নাতবাবুর অপর্ণা দেবীকে খুন করে কোন লাভ নেই, এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ? কাউকে আর সন্দেহ হয় আপনার ?

—কার নাম করব বলুন ?

—ধরুন, এমনও তো হতে পারে, গুরুতর মস্তিষ্ক-বিকারগ্রস্তা অপর্ণা দেবী স্বামীকে বিপদে ফেলবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন ? এমন হতে পারে কি না ?

—পারে। তবে এরকম হয়নি।

বাসব গলা নামিয়ে বলল, হয়নি কি করে জানলেন ?

ইতস্ততঃ করলেন গৌর বসাক।

বললেন শেষে, অপর্ণা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চলাফেরা করা ওর পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার ছিল।

স্বেচ্ছায় ও জানালার কাছে যেতে পেরেছিল বলে আমার মনে হয় না।

—আপনি বোধহয় আপনার এই ধারণার কথা কোর্টকে বলেননি মিঃ বসাক।

—না। আমাকে সেখানে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তারই উত্তর দিয়েছিলাম মাত্র।

বাসব একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, অপর্ণা দেবীর দেওয়া টাকা কি করবার পরিকল্পনা আছে আপনার ?

—কিছু না। ব্যাঙ্কে রেখে দেব। ব্যবসায় টাকা খাটাবার মত বুদ্ধি আমার নেই।

—ধন্যবাদ। আপনি আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমার। বসুন, চা এল বলে।

গৌর বসাক উঠে দাঁড়ালেন।

—না, না, তার প্রয়োজন নেই। চায়ে আমি তেমন তৃপ্তি পাই না। আচ্ছা নমস্কার।

রাস্তা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল বাসব। একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ইসারা করতেই থামল। ট্যাক্সির দরজা খুলে বসাক ভিতরে গিয়ে বসলেন।

বাসব বলল, ক্ষমা করবেন, আরেকটা কথা জানবার ছিল, দুর্ঘটনার দিন রাত্রে আপনি বাড়ি ছিলেন না, সংবাদ পেয়েছি। কোথায় ছিলেন ?

দৃঢ়গলায় বাসক বললেন, আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন। আমি বাড়িতেই ছিলাম।

ট্যাক্সি তত্ক্ষণে গতি নিয়েছে।

বাসব ফিরে এসে শৈবালকে কথাটা বলতেই প্রশ্ন করল, তুমি কিভাবে জানতে পারলে গৌরবাবু দুর্ঘটনার রাতে বাড়ি ছিলেন না ?

—কি করে আবার, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম।

বাসব সমস্ত দুপুর কোথায় ডুব মেরে রইল। গলদঘর্ম অবস্থায় ফিরে এল সন্ধ্যার পর।

শৈবাল তারই অপেক্ষায় ঘণ্টা দুয়েকের উপর বসে আছে।

বাসব এসেই গলা ছাড়ল, বাহাদুর এক গেলাস জল !

বাহাদুর জল নিয়ে আসতেই এক চুমুকে গেলাস শেষ করে কৌচে ক্লান্ত শরীর ঢেলে দিল। সিগারেট ধরাল।

শৈবাল বলল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—প্রথমে এক সেক্রেটারীকে নিধন করে, নারী বাহিনীর মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম।

—হেঁয়ালি সরল কর বৎস। কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

বাসব মৃদু হেসে বলল, প্রথমে বিনয়বাবুর সেক্রেটারীর ওখানে গিয়েছিলাম। অধীর রায়। ভদ্রলোক বেশ ঘোড়েল। প্রথমে কোনকিছুই বলতে চায় না। তারপর বহু কায়দায় আসল কথার সন্ধান পাওয়া গেল। দুর্ঘটনার দিন নাকি তাঁর মোটেই শরীর খারাপ হয়নি। অশোকবাবু তাঁর ব্যক্তিগত কাজে কলকাতার বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

—তবে বিনয়বাবু যে বললেন তাঁর সেক্রেটারী অসুস্থ।

—কারণ অশোকবাবু এই কথাই অধীর রায়কে বলতে বলেছিলেন। এই মিথ্যাচারে তাঁর আটকায়নি। কারণ অর্থের বিনিময়ে মাঝে মাঝে তিনি অসুখের অজুহাতে ডুব মেরে থাকেন অশোকবাবুর ব্যক্তিগত কাজ করবার জন্য।

—ব্যাপার ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে।

—হুঁ। এখন অনুসন্ধান করে দেখতে হবে অশোক রক্ষিতের ব্যক্তিগত কাজটা কি? তারপর শোন, অধীর রায়ের বাড়ি থেকে সোজা চলে এলাম গোল্ড মেমোরিয়াল স্কুলের টিচার্স হোস্টেলে। সুদীপা রায়ের আস্তানা। বুঝতেই পারছ নারীদের রাজত্ব। ওই নারীকুলের মধ্যে পড়ে বেশ নাস্তানাবুদ হবার পর সুদীপা দেবীর সন্ধান পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা এখনও নিজের বিমর্ষ ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নতুন কথা তাঁর কাছে পাওয়া গেল না। তিনি এভাবে সুস্নাতবাবুকে নিজের করে পেতে চাননি।

সুদীপা রায়ের সঙ্গে সুস্নাত চৌধুরীর বিয়েটা হয়ে যাবে, তোমার কি মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। খুবই স্বাভাবিক। চল, ওঠা যাক।

—আবার কোথায়?

বিনয়বাবুর বাড়ি। অপর্ণা দেবীর ঘরখানা আমায় আরেকবার দেখতে হবে।

দুজনে উঠে পড়ল।

গন্তব্যস্থলে ওরা দুজন যখন পেঁছাল তখন রাত আটটা। ম্রিয়মানমুখে বিনয়বাবু পার্লারে বসেছিলেন। ওদের দেখে মৃদু গলায় স্বাগত জানালেন। বাসব তাঁকে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য জানাতেই তিনি দুজনকে উপরে নিয়ে চললেন। চাবি খুলে দিতেই দু'জনে ভেতরে গেল—মর্মন্তুদ ঘটনার নীরব সাক্ষী ঘরখানা।—কে যেন হাঁ করে ওদের গিলতে এল।

বিনয়বাবু ঘরের মধ্যে গেলেন না।

বাসব প্রথমে খাটের দিকে এগিয়ে গেল। তোষক ও গদি উল্টে-পাল্টে দেখল। কিছু নেই। খাটের পাশেই বুককেসটা। থরে থরে বই সাজান তাতে। বাসব একের পর এক বইয়ের পাতা উল্টে দেখে যেতে লাগল। কয়েকখানা বইয়ের মধ্যে থেকে খানচারেক টাইপকরা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

এরপর ও এগিয়ে গেল জানালার কাছে।

এই জানালা দিয়েই অপর্ণা চৌধুরীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল হত্যাকারী। জানালার ভেতর ও বাইরে গভীরভাবে পরীক্ষা করার পর বাসব

একটা কাণ্ড করে বসল। জানালার উপর উঠে একহাত দিয়ে পাল্লা চেপে ধরে অন্যহাত দিয়ে জানালার বাইরের দিকের উপরের বিটে পোঁতা একটা হুক পরীক্ষা করতে লাগল।

পরীক্ষা শেষ করে নেমে এল। মুখে তার সাফল্যের হাসি।

শৈবাল ব্যগ্রগলায় প্রশ্ন করল, কি হে মনে হচ্ছে যেন কোন জাঁদরেল সূত্র হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছ ?

—মুঠোর মধ্যে না পেলেও আওতায় পেয়েছি বলতে পার। তবে এতে যে সব ওলট পালট হয়ে যাবে ডাক্তার। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়।···

বাসব নিজের কথা শেষ করল না।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাওয়া সেরে দেড়টার সময় শৈবাল হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এল। বাসব তখন নিজের শোবার ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। শৈবাল খাটের উপর গদিয়ান হয়ে বসল বালিশ কোলে করে।

বাসব একবার তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পায়চারি করে চলল।

এক সময় পায়চারি থামিয়ে বলল, কাল বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়ে আমাদের ঠকতে হয়নি।

—তোমার হাবভাব দেখে তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু লাভটা কি ধরনের হয়েছে আমার পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর।

—দেখ ডাক্তার, তোমাকে কতবার বলেছি, চোখ আর কান খুলে থাক, তা তুমি থাকবে না। তুমি তোমার জীবনে বহু জানালাই দেখেছ, কিন্তু কোথাও কি জানালার বাইরের দিকে হুক আটকান রয়েছে দেখেছ ? বিশেষ কয়েক তলার উপরের কোন জানালায় ?

—না। তাছাড়া ও জায়গায় হুক আটকে কোন লাভ নেই।

—তাহলেই বোঝ। অথচ হুক আটকান রয়েছে। কেন—তোমার কি মনে হয় ডাক্তার ?

—আমার ? আমার মনে হয়···

—তাছাড়া, এই চিঠিটা—এতেও একটা বড় রকম সূত্র পাওয়া গেছে।

—চিঠি !

—তোমার স্মরণশক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। কাল অপর্ণা দেবীর ঘরে কতকগুলো বইয়ের মধ্যে খান কয়েক কাগজ পাইনি, এই চিঠিখানা তারই অন্যতম।

বাসব হস্তস্থিত চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরল।

শৈবাল পড়ল। টাইপ করা ইংরাজী চিঠি।

সোমবার

অপর্ণা দেবী,

এর পূর্বে আপনার স্বামী সম্বন্ধে যা-যা বলেছি ক্রমেই তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। তিনি সুদীপা দেবীর প্রতি যে ক্রমেই গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়ছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। উপস্থিত আপনার অসুস্থতায় ওঁরা স্বাধীনতার চরম পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছেন।

আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, সুস্নাতবাবু আজই রাত্রে এই বাড়িতে সুদীপা দেবীর সঙ্গে মিলিত হবেন। আপনি যদি চাক্ষুস দেখতে চান, তাহলে মঙ্গলবার দিন রাত পৌনে বারটার পর (যে সময় আপনার স্বামী ঘরে অনুপস্থিত থাকবেন) নিশ্চিতভাবে উঠোনের দিকের মাঝের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াবেন। ওঁদের দুজনকে দেখতে পাবেন বাগানে।

শুভেচ্ছার পর

তলায় কোন স্বাক্ষর নেই।

—চিঠিখানা পড়ে কি বুঝলে?

চিন্তিত গলায় শৈবাল বলল, প্রথমত, চিঠিখানায় জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার ভাব ফুটে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, চিঠির ধরন দেখে মনে হয়, পত্রপ্রেরক আরো কয়েকবার অপর্ণা দেবীকে চিঠি লিখেছে।

—ব্রেভো ডাক্তার। এক্‌জ্যাক্টলি টো টো। গৌর বসাকের কথায় আমরা জানতে পেরেছি। অপর্ণা দেবী খাট থেকে তেমন ওঠা-নামা করতে পারতেন না, তবু তাঁকে কোনক্রমে জানালার কাছে যেতে হয়েছিল এই চিঠির কয়েক লাইনের দরুন। হিংসাপরায়ণা, শূন্য মনোবলের অধিকারিণী অপর্ণা চৌধুরী এই চিঠিখানা পেলেই যে যথাসময় জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল হত্যাকারী।

—চিঠিখানা কে লিখেছিল বলে তোমার মনে হয়?

—সে পরের কথা। তবে যে-ই লিখে থাকুক তার সাবধানতার অন্ত নেই। তবুও কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে, যে মেসিনে টাইপ করা হয়েছে চিটিখানা, তার টেপটা বেশ পুরানো হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়, চিঠির কাগজ পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেছে, কাগজ অত্যন্ত দামী। সাধারণ মানুষ এ কাগজ ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া কাগজের উপর দিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওখানে কারুর নাম ও ঠিকানা ছিল।

—কিন্তু আমরা আগেই আন্দাজ করেছি অপর্ণা দেবী এখানা ছাড়াও আরো কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিলেন। সেগুলো কোথায়?

বাসব একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমার মনে হয়, যে এই ধরনের চিঠি দিত, সে আবার সময় মত অপর্ণা দেবীর অজান্তে ওগুলো সরিয়ে ফেলত। কিন্তু

এটার বেলায় তা হয়নি। কারণ খুন হওয়ার পর থেকেই ঘরখানা ছিল পুলিশের হেফাজতে।

বাসব আবার পায়চারি আরম্ভ করল।

কয়েক মিনিট আবার নীরবতা। তারপর—

—দেখ ডাক্তার, বাসব বলল, আজ রাত্রে আমাদের আরেকবার রক্ষিত বাড়িতে যেতে হবে।

—আবার কেন ?

—তবে এবার যাওয়ার মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য থাকবে।

—বৈচিত্র্য !

—হ্যাঁ। সকলেই অজান্তেই আমরা ও বাড়িতে ঢুকে পড়ব।

কলিং বেল বেজে উঠল।

—সুস্নাতবাবু এসেছেন। এখানে আসবার জন্য তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছিলাম।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাহাদুরের সঙ্গে সুস্নাত ঘরে প্রবেশ করল। তার চেহারার উপর যেন একটা ম্রিয়মানভাবে আস্তরণ। বাসবের অনুরোধে কৌচে বসল।

—আপনাকে এখানে ডেকে আনার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ চৌধুরী, তবে—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই সুস্নাত বলল, আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই মিঃ ব্যানার্জী। স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন।

—ধন্যবাদ। আপনি পুলিশকে বা কোর্টে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা আর করতে চাই না। আমার গোটা কয়েক অন্য ধরনের প্রশ্ন আছে।

—বলুন !

—আপনার স্ত্রীকে দেখাশুনা করবার জন্য কোন নার্স ছিল কি ?

—ছিল। তবে অপর্ণা মারা যাবার কয়েকদিন আগে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

—কেন ?

—কারণ ওর শরীর ভালর দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া অপর্ণাই বলেছিল ওর আর নার্সের প্রয়োজন নেই।

—নার্সের ঠিকানাটা আমায় দিতে পারেন ?

—ঠিকানা ? অশোক আপনাকে ঠিকানা বলতে পারবে। ও-ই তাকে অ্যাপয়েণ্ট করেছিল। তবে আমি আপনাকে তার নাম ও কর্মস্থল বলতে পারি।

—বেশ তো, তাতেও আমাদের কাজ হবে। বলুন।

—অরুণা দে। পার্ক স্ট্রীটের সিটি নার্সিং হোমে কাজ করে।

—মিঃ চৌধুরী, অপর্ণা দেবীকে হত্যা করার ব্যাপারে আপনার বদ্ধমূল ধারণাটি কি?

—ধারণা? আপনার প্রশ্নের উত্তর কি দেব বুঝতে পারছি না মিঃ ব্যানার্জী, আমি কাউকেই সন্দেহ করতে পারছি না। আবার সময় সময় অনেককেই সন্দেহ হচ্ছে।

বাসব সিগারেট টিন এগিয়ে ধরল।

—সিগারেট প্লিজ!

—নো, থ্যাঙ্কস্।

বাসব একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনার স্ত্রী উইল করেছেন একথা জানতে পারলেন কবে?

—সে মারা যাবার পর। প্রবেটের জন্য চিঠি এসেছিল। তাতেই জানতে পারলাম।

—উইল তাহলে আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞান্তেই হয়েছিল? অপর্ণা দেবী সম্ভবতঃ অসুস্থ শরীরে বাপেরবাড়ি যাবার পর উইল করেছিলেন?

—আমারও তাই ধারণা।

—হুঁ। আপনি জানতেন অপর্ণা দেবীকে গৌর বসাক বিয়ে করতে চেয়েছিল?

—বিয়ের পর শুনেছিলাম।

—ওয়েল মিঃ চৌধুরী, গৌর বসাক কি কোনকালে ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন?

এই ধরনের প্রশ্ন শুনে সুস্নাত অবাক হল।

যতদূর জানি, না।

—আপনি?

আমি চিরকালই খেলাধূলায় উৎসাহী। এখনও কলেজের গেম সেক্সানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না।

বাহাদুরকে ডেকে তিনকাপ কফির অর্ডার দিল শুধু।

বেশ অন্ধকার জায়গাটা।

শৈবাল রেলিং দেওয়া বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে আছে। চট করে কারুর পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া রীতিমত কঠিন।

রাত তখন একটা পঁয়ত্রিশ।

অন্ধকারের মধ্যে আবছাভাবে রক্ষিতদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাসব এখানে শৈবালকে দাঁড়াবার কথা বলে সেই যে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে এখনও তার পাত্তা নেই।

কি করছে এতক্ষণ!

সময় কেটে চলেছে।

শৈবাল এক সময় রেডিয়ম ডায়েল যুক্ত রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকাল। দুটো কাঁটাই তিনটের ওপর এসে একত্রিত হয়েছে। তিনটে পনেরো।

শৈবালের অস্বস্তি ভাবটা উদ্বিগ্নতায় পরিণত হয়। বাসবের কি কোন বিপদ হল? কিন্তু কি ধরনের বিপদ হতে পারে তার? কোন গোলমাল তো বাড়ির মধ্যে থেকে ভেসে আসছে না।

এই সময় সমস্ত চিন্তার অবসান হল।

চাপা গলায় শৈবাল প্রশ্ন করল, এত দেরী হল যে?

—দেরী হবে না, কি বলছ! একটা তালা দেওয়া ঘরে প্রথমে বহু কষ্টে ঢুকতে হল। তারপর ফিঙ্গার প্রিণ্ট তুলতে কিছু সময় তো লাগবেই।

কথা শেষ করেই বাসব নিজের হাতে ফিঙ্গার প্রিণ্ট তোলার সরঞ্জাম সমেত এটাচি তুলে ধরল।

—ফিঙ্গার প্রিণ্ট! কার—

—এখানে আর কথা নয়! এবার চল ডাক্তার। বিটের কনষ্টেবলের চোখে যদি পড়ে যাই তাহলে বাকী রাতটুকু হাজতে কাটানো ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

পরের দিনটা বাসবকে চোখে দেখা গেল না। শৈবাল কয়েকবার এসেও তার দেখা পায়নি। বাসবের এই হাবভাবে ও বুঝতে পেরেছিল, তদন্ত শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যবনিকা পড়তে বিশেষ দেরী নেই।

বাসব বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে।

প্রচুর ঘোরাঘুরি হয়েছে তার; ঘুমও পেয়েছে জবর রকম। পোশাক ছেড়ে ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। বিছানায় বসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। ডায়াল করল একটা নম্বর।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তারের অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

—হ্যালো—

—কে ডাক্তার···কি করছো এখন···কি বললে···বৌ-এর শাড়ি কুঁচিয়ে দিচ্ছ··· দিচ্ছ না···আমার তাহলে শুনতে ভুল হয়েছে···কোথায় ছিলাম সমস্ত দিন জানতে চাইছো? সে অনেক কথা···আহা-হা চটছো কেন, তোমাকে মোটেই

এড়িয়ে যাচ্ছি না·· হ্যালো শোন, কাল সকালেই চলে আসবে এখানে, অনেক কথা আছে···ছেড়ে দিচ্ছি···বাই বাই···

সকাল সাড়ে সাতটার সময় শৈবাল এসে উপস্থিত হল।

বাসব কৌচে বসে পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট ফুঁকছিল। শৈবাল বসতে বসতে বলল, খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে, কেসটা হেরাহেরি করে এনেছো বোধহয় ?

—বলা বাহুল্য। আজই রহস্যের উপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে পারব, কিন্তু আর থাকা চলবে না। বেরুতে হবে।

—কোথায় ?

—আপাততঃ সুস্নাতবাবুর কাছ হয়ে বিনয় রক্ষিতের বাড়ি।

—তা নাহয় গেলাম। কিন্তু—

—অধৈর্য হয়ে উঠেছো বুঝতে পারছি। যথাসময় জানতে পারবে। এস—

রাস্তায় নেমে ওরা ট্যাক্সি ধরল। সুস্নাতকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। মহাসমারোহে দুজনকে অভ্যর্থনা করল ও।

চা-পর্বের পর সুস্নাত প্রশ্ন করল বাসবকে, আপনার কাজের কতদূর ?

—কাজের প্রায় শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

—আপনি জানেন কে খুন করেছে ?

—জানি বইকি !

—বলেন কি ! কে সে ?

—আমি কোনদিনই হয়তো তাকে ধরতে পারতাম না। শুধু একটা ছোট ভুলের দরুন সে আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। তবু আমি তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

শৈবাল উৎসুক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল।

সুস্নাত অত্যন্ত দ্রুতগলায় বলল, কে—কে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, মিঃ ব্যানার্জী ?

—আপনি তার নাম শুনলে মোটেই খুশি হতে পারবেন না মিঃ চৌধুরী।

—তবু আমি জানতে চাই হত্যাকারী কে ?

বাসব একটু চুপ করে থাকার পর স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি—।

—কি—কি বললেন !!!

আপনি—আপনিই অপর্ণা দেবীকে হত্যা করেছেন।

ঘরের মধ্যে অপর্ণা চৌধুরী স্বয়ং এসে দাঁড়ালেও শৈবাল হয়তো এতটা আশ্চর্য হত না। বাসবের কথায় যতটা হল।

সুস্নাত উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমাট বেঁধেছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর করে।

তীব্রগলায় ও বলল কি বলছেন আপনি। জানেন, এককথার অর্থ কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে?

—জানি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই কথাটা বলেছি। আপনি আইনকে ফাঁকি দিতে পারেন, সেই সঙ্গে আদালতকেও। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। আপনি কিভাবে জানালার উপরকার হুকে ল্যাসো লাগিয়ে নীচে থেকে অপর্ণা দেবীকে উঠানে এনে ফেলেছিলেন, তা আমার অজানা নয়। হুকের কাছে-পিঠে আমি যে আঙুলের ছাপ পেয়েছি তার সঙ্গে গত পরশুদিন আমার বাড়িতে পেয়ালার উপর যে হাতের ছাপ ছেড়ে এসেছেন—দুটোই হুবহু মিলে গেছে। এইটুকু প্রমাণই অবশ্য আপনাকে বেকায়দায় ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আরো আছে। অপর্ণা দেবীকে যে শেষ উড়ো চিঠি দিয়েছিলেন তাতে শুধু আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই—কাগজটাও হল আপনাদের কলেজের ডিপার্টমেণ্ট অফ হিস্ট্রির লেটার প্যাড। শুধু উপরকার পরিচয়-লিপিটুকু কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমি আপনাদের কলেজ থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করেছি। আরো প্রমাণ আছে আমার হাতে, যদি শুনতে চান বলতে আমার আপত্তি নেই।

সুস্নাত আর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে বাগানের দিকের খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। প্রায় মিনিট সাতেক কেটে গেল একইভাবে।

জানালার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল। ওর সবল, দীর্ঘ দেহটা ঝুঁকে পড়েছে। তীব্র ক্লান্তি ওর সুন্দর মুখের সমস্ত সুষমাকে একেবারে নিংড়ে নিয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। স্পষ্ট অথচ দ্রুতগলায় বলল, আমি—আমিই তাকে মেরেছি। কিন্তু কেন, কেন তাকে মেরেছি জানেন? আমার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, প্রতি পদক্ষেপে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুড়িয়ে দেওয়াই ছিল তার আনন্দ···আমি পারিনি···আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল বাসববাবু···আমার মনে হয় আপনিও আমার জায়গায় থাকলে ঠিক এই কাজই করতেন।

সুস্নাত থামল।

বাসব এগিয়ে গেল ওর কাছে।

নরম গলায় বলল, আমি জানি আপনি ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে এই কাজ করেছেন। তবু আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোন ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এস ডাক্তার—

রাস্তায় নেমে শৈবাল বলল, কি হে এইভাবে চলে এলে যে?

—আশ্চর্য হচ্ছ, না? কিন্তু তোমার কথার উত্তর দেওয়ার আগে আমায় একটা ছোট কাজ সেরে আসতে হবে।

বাসব রাস্তার উল্টাদিকের একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে ঢুকল। বেরিয়ে এল মিনিট কয়েক পরে। ট্যাক্সি ডাকল তারপর।

হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল ট্যাক্সিখানা।

শৈবাল নিজের প্রশ্ন পুনরুক্তি করল, তুমি সুস্নাতবাবুকে ছেড়ে চলে এলে ?

—হ্যাঁ। তাঁকে বাঁচবার একটা সুযোগ দিলাম।

—তার মানে ?

—আইনকে নিজের হাতে উনি নিয়েছিলেন সত্যি, কেন নিয়েছিলেন ? নিজে নির্মল চরিত্রের না হয়েও পদে পদে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন অপর্ণা দেবী। সহ্যের একটা সীমা আছে—উনি ঠিকই বলেছিলেন, ওরকম পরিবেশে পড়লে আমিও হয়তো নিজের হাত রক্তে রাঙিয়ে তুলতাম। সব অপরাধ সব সময় অপরাধের মাপকাঠিতে একই শ্রেণীর হয় না ডাক্তার। তাই আমি সুস্নাতবাবুকে সুস্থ মন নিয়ে বাঁচার একটা অবকাশ দিলাম। সুদীপা দেবীকে বিয়ে করে উনি সুখী হোন !

—বিনয়বাবুকে কি উত্তর দেবে ?

—তাঁকে জানিয়ে দেব বিশেষ কারণে কেসটা হোল্ড করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

—কিন্তু তুমি হঠাৎ ওই ওষুধের দোকানে গিয়ে ঢুকলে কেন ?

—সুস্নাতবাবু পুলিশের কাছে গিয়ে সারেন্ডার করতে পারেন, এই সম্ভাবনা থাকায় ফোন করে জানিয়ে দিলাম আমার মনোভাব।

পরের দিন মধ্যাহ্নে আহারের আমন্ত্রণ ছিল শৈবালের বাড়িতে বাসবের। বেশ রেঁধেছে সোমা। পরিপাটি করে আহার শেষ করেছে দুজনে। খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে বাসব বলল, যাই বল ডাক্তার, বাঙালী মেয়েদের রান্নার ব্যাপারে বেশ একটা ঐতিহ্য আছে।

—তা আছে। তবে ক্রমেই সে ঐতিহ্যে ভাঁটা পড়ছে। আজকার আধুনিকারা রান্নাঘরে পারতপক্ষে যেতে চায় না। অবশ্য আমার বৌয়ের কথা আলাদা। আহা ! রান্না তো নয় যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা···

শৈবালের কথা শেষ হল না। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সোমা, থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। বাসব জোরে হেসে উঠল।

এরপর তিনজনের মধ্যে গল্প-গুজব জমে উঠল।

এক সময় শৈবাল বলল, বাজে কথা থাক। অপর্ণা হত্যার উপসংহারটা এবার শোনাও দেখি। কিভাবে তুমি সুস্নাতকে সন্দেহ করলে ? তুমি বলেছিলে একটা ছোট্ট ভুলের দরুন ও তোমার চোখে ধরা পড়ে গেছে, সেটা কি ?

সোমা ঘটনাটা মোটামুটি শুনেছিল শৈবালের মুখ থেকে। কাজেই

উপসংহারটা জানবার আগ্রহ তারও কিছু কম নয়। সে উৎসুক বাসবের দিকে তাকাল। বাসব টেবিলের উপর থেকে টিনটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বার কয়েক ধোঁয়ার রিং রচনা করে বলল, ঠিক প্রথমেই সুস্নাতবাবুকে আমি সন্দেহ করিনি। আমার সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছিল গৌর বসাকের চারপাশে। কারণ, কুমারী জীবনে অপর্ণা দেবী তাঁর প্রণয়প্রার্থী ছিলেন। বিয়ের পরও যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না একথা জোর দিয়ে বলার মত কোন সঙ্গত কারণ চোখে পড়েনি। গৌর বসাক হয়তো অপর্ণা দেবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করেছিলেন টাকার লোভেই। উইলে এতগুলো টাকা পাবার পর—যাতে আবার অপর্ণা দেবী উইল পাল্টাতে না পারেন তার জন্য গৌরবাবু তাঁকে হত্যা করেছেন হয়তো। আমি ভাবতে লাগলাম। অশোক রক্ষিত, ম্যানেজার হরিশঙ্কর, এমন কি বিনয়বাবুকেও সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যায় না বোধহয়। বিনয়বাবু সেদিন কেন সুস্নাতবাবুকে লাইব্রেরীতে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এটা ইচ্ছাকৃত, না, স্বাভাবিক ঘটনা ?

আমি চিন্তার মোড় ঘোরালাম। কে হত্যা করেছে তা জানবার আগে কিভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তা জানা দরকার। অপর্ণা দেবী অসুস্থা ছিলেন, নিশ্চয় অকারণে তিনি গভীর রাত্রে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াননি! তাঁকে কোনক্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিভাবে ? কিভাবে তা তো তুমি জান ডাক্তার। তাঁর হিংসুক মনের উপর চিঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তিনি সময় মত জানালার ধারে না গিয়ে থাকতে পারেননি।

—কিন্তু—শৈবাল বলল, ওঘরে তিনখানা জানালা ছিল। অপর্ণা দেবী মাঝেরটার সামনে না দাঁড়িয়ে অন্য যে-কোন একটার সামনে গিয়েও তো দাঁড়াতে পারতেন। হত্যাকারীর সুবিধার জন্য তিনি ঠিক মাঝেরটার সামনে কেন দাঁড়িয়েছিলেন ?

—কারণ, চিঠিতে মাঝের জানালার কথাই লেখা ছিল। অপর্ণা দেবীর মনের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, তিনি অন্য কোন বিষয়ে মন দেননি। চিঠির নির্দেশ মত কাজ করে গিয়েছিলেন। মাঝের জানালার বাইরের দিকে একটা হুক লাগান রয়েছে দেখেই আমার মনে খটকা লেগেছিল। আর দুটো জানালায় তো হুক নেই! ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, হুকের লোহা সম্পূর্ণ মোড়া নয়, উপরের দিকটা খোলা। তখনও সুস্নাতবাবু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। কারণ তাঁর পক্ষে কোনমতেই খুন করা সম্ভব নয়। তিনি নীচে ছিলেন। তাঁকে নীচে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, তিনতলার অপর্ণা দেবীর ঘর থেকে একতলার লাইব্রেরী ঘরে আসতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগে। সুস্নাতবাবুর পক্ষে উপরে কাজ সেরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহের কাছে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু কানাইয়ের একটা কথা আমায় চিন্তিত করে তুলল। কানাই বলেছিল, ও একটা চীৎকার এবং পড়ার শব্দ শুনে বাইরে থেকে ছুটে আসে। এই সময় ও জামাইবাবুকে বই-পত্তরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

বাসব থামল। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রের মধ্যে নির্মূলভাবে গুঁজে দিয়ে আবার আরম্ভ করল, তোমরা বলবে এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? পারে। কানাই বাইরের বাগানে ছিল আর সুস্নাতবাবু বাড়ির ভিতরে ছিলেন। দুর্ঘটনার স্থল তাঁর কাছ থেকে অনেক কাছে ছিল, তবু তিনি কানাইয়ের আগে সেখানে পেঁছাতে পারেননি কেন? সঙ্গে সঙ্গে হুকটার কথা আমার মনে পড়ল। রহস্য অনেক সরল হয়ে এল। সুস্নাতবাবুদের ভাইস-প্রিন্সিপাল দেবেন দত্তর এককালে আমি ছাত্র ছিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক সংবাদ সরবরাহ করলেন। জানতে পারলাম সুস্নাতবাবু সত্যি একজন ভাল এথালেট। কসরৎও করতে পারেন। বিশেষ করে দড়ির অনেক খেলা তাঁর আয়ত্বে। একবার ছত্রিশগড়ের জঙ্গলে ছাত্রদের নিয়ে এক্সকারসান করতে গিয়ে পনেরো হাত দূরে একটা বন্য শুয়োরকে ল্যাসোর সাহায্য তিনি ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে হিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের প্যাডের একটা কাগজ চেয়ে নিলাম। হিসাবে ভুল হয়নি আমার। উড়ো চিঠির কাগজের সঙ্গে এই প্যাডের কাগজের হুবহু মিল হল। ফিঙ্গার প্রিণ্টও পাওয়া গেল। কালবিলম্ব না করে সকেলের অজান্তে রাত্রে অপর্ণা দেবীর ঘরে হানা দিলাম। জানালার উপর দিকের বিটে ফিঙ্গার প্রিণ্ট আবিষ্কার করতে আমার অসুবিধা হল না। তারপর সুস্নাতবাবু খুনীর আকার নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আমার চোখের সামনে ধরা দিলেন।

বাসব আবার থামল।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, আমি বিনয়বাবুর সেক্রেটারী ও নার্স অরুণা সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। কিছু অন্ধকার আরো পরিষ্কার হল। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছিল, যদিও এতে অনেকখানি অনুমান আছে তবু আমার বিশ্বাস, সম্ভ্রান্ত গৌর বসাকের সঙ্গে অপর্ণা দেবীর একটু ইয়ে ছিল। কিন্তু বিনয়বাবুর অনিচ্ছায় দুজনের বিয়ে হয়নি। অপর্ণা দেবীর বিয়ের পর অশোক রক্ষিত বা গৌর বসাক নিশ্চয় তাকে উত্তেজিত করতেন সুস্নাতবাবুর চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল এবং অপর্ণা দেবী মালঙ্কোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অশোকবাবুর রেসখেলা ইত্যাদির অন্যতমা সঙ্গিনী হচ্ছেন অরুণা সেন। পেশা নার্স। অশোকবাবু তাঁকে নিয়ে এলেন বোনকে দেখাশুনা করবার জন্য। অবশ্য প্রকৃত কারণ তা নয়, অন্য উদ্দেশ্য ছিল। অশোকবাবুর ক্রমেই প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজের বোন-ভগ্নীপতির তিক্ত সম্পর্ককে

মূলধন করে কাজে নামলেন। অরুণা সেন পুলিশের ভয়ে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার করেছেন। তাঁর সাহায্যে অশোকবাবু বোনকে উড়ো চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে অপর্ণাদেবীর মন আরো বিষিয়ে উঠল এবং বদ্ধমূল ধারণা হল তাঁর মারা যেতে বিশেষ দেরী নেই। অথচ তিনি মারা গেলে তাঁর বিপুল সম্পত্তি স্বামীর করায়ত্ব হবে। কাজেই তিনি সুস্নাত চৌধুরীকে বঞ্চিত করে এক উইল করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা রেজেষ্ট্রিও হয়ে গেল। অবশ্য এতেই বলতে গেলে অপর্ণা দেবী নিজের মৃত্যুকে নিজেই আমন্ত্রণ জানালেন। সুস্নাতবাবু তাঁকে হত্যা না করলে তিনি অশোকবাবুর হাতে নিহত হতেন।

বাসব একটু থেমে দম নিল যেন।

তারপর—স্ত্রীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তাঁকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা ছিল না সুস্নাতবাবুর। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে অশোকবাবুর চক্রান্তটা ধরে ফেললেন। এদিকে স্ত্রীর ব্যবহারও জঘন্য হয়ে উঠেছে। সহ্যের শেষ সীমায় পা দিয়ে উনি প্ল্যানটা চক-আউট করলেন। এখন যদি তিনি অপর্ণা দেবীকে হত্যা করেন তাহলে পুলিশ তাকে প্রথমে সন্দেহ করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের দরুন শেষ পর্যন্ত অশোক রক্ষিত বা গৌর বসাক জালে জড়িয়ে পড়বেনই। কোন একদিন—মনে হয় যখন অপর্ণা দেবী নিদ্রিতা, সেই সময় জানালার উল্টোদিকের বিটে হুকটা পুঁতে ফেলেন সুস্নাতবাবু। তারপর অশোকবাবুর ধরনের এক উড়ো চিঠি দিলেন। তিনি জানতেন এই চিঠিতেই কাজ হবে এরপর এল সেই চরম দিনটি। সুস্নাতবাবু কোন একটা ছুতো করে নীচে নেমে যেতেনই, কিন্তু ছুতোর প্রয়োজন হল না। ভাগ্যদেবী সদয় হলেন ওঁর উপর—বিনয়বাবু ফোনে তাঁকে নীচে ডাকলেন। অ্যালিবাই স্ট্রং হল। কানাই ওঁকে লাইব্রেরীতে দেখল, কাজেই উনি আরো নিরাপদ হলেন। বারটা বাজার কয়েক মিনিট আগে সুস্নাতবাবু উঠানে এসে দেখলেন অপর্ণা দেবী জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য নেমে আসবার আগে স্ত্রীর বাথরুম বা ওই ধরনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হুকে দড়িটা লাগিয়ে এসেছিলেন। দড়িটা ধীরে ধীরে ঢিল দিলেন। ওদিকে অপর্ণা দেবী বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফাঁসটা তাঁর গলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুস্নাত এক হেঁচকা টান দিলেন—ভদ্রমহিলা নীচের দিকে পড়লেন। দড়িটাও খুলে এল ওই সঙ্গে। সুস্নাতবাবু দড়িটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে লাইব্রেরী ঘরের সামনে চলে এলেন।

এই সময় কানাই তাঁকে দেখতে পায়।

শৈবাল বলল, দড়িটা গেল কোথায়?

—কোথায় আবার ! সিঁড়ি বা লাইব্রেরীর আশে-পাশে পড়েছিল বোধহয়, কে তার খোঁজ রেখেছে ।

—আচ্ছা, তুমি একবার প্রশ্ন করেছিলে কবে বাড়িটা হোয়াইট-ওয়াশ করান হয়েছে ?

—জরুরী প্রশ্ন নয় । হরিশঙ্করবাবুকে ঘাবড়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল ।

বাসব কথা শেষ করে সিগারেট ধরাল ।

ডাঃ গুহ বাসবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে এত কথা জেনে নিয়েছিলেন । সুস্নাত যে প্রকৃতই হত্যাকারী তা পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি । বাসব ডাঃ গুহকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, তিনি যেন একথা তাদের না জানান ।

আমিও তোমাদের ওই কথাই বলছি । আর কারুর কাছে কথাটা ফাঁস করে দিও না যেন । সুস্নাতকে শান্তিতে বাঁচতে দাও আর কিছুদিন । কিন্তু না আর কোন কথা নয় । আর বকতে পারছি না । শরীরটা কেমন আনচান করছে । বেশ বুঝতে পারছি এবার আমার খেলাও শেষ হল ।

ডোমেরা যেভাবে মৃতদেহ বয়ে আনে ঠিক সেইভাবে ধরাধরি করে ওরা হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে উন্মুক্ত কোন স্থানে ফেলে আসবে । রোদে, বৃষ্টিতে আমি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ব ক্রমে । তারপর—না—না—তারপরের কথা আর ভাবতে পারছি না । এটুকু অন্তত আমি জানি, এই পৃথিবীতে কারুরই চিরকাল টিকে থাকার উপায় নেই ।

তবু আমার বুকের মধ্যেটা হু হু করছে । সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের উপর মায়া পড়ে গেছে । স্বভাবে তোমরা নিম্নশ্রেণীর জীবদেরও লজ্জা দাও, এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও মায়ার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না । কিন্তু—না—আর কোন কথা নয় । যাও—তোমরা এবার যাও । আমি এবার প্রতীক্ষা করতে থাকি শেষ হয়ে যাওয়ার চরম মুহূর্তের জন্য ।